শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মরণীয় ইনিংস

স্মরণীয় ইনিংস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

শ্রীপ্রবীর মজুমদার

বন্ধুবরেষু

অতলান্ত সাগরের বুকে দক্ষিণ আমেরিকার ঠিক নীচে কতকগুলো দ্বীপ গায়ে গা ঠেকিয়ে ভেসে আছে। কোনটার নাম ত্রিনিদাদ, কোনটা জামাইকা, গায়না, বারবাডোজ, আবার একটির নাম লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ। সমুদ্রের জল এসে আছড়ে পড়ে সাগরবেলায়। সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছ। একটু এগিয়ে দ্বীপের মধ্যে ঢুকলে চোখে পড়বে সোনালী আখের ক্ষেত। ছোট ছোট পাহাড়। পিচ ঢালা রাস্তাগুলো দ্বীপের বুক চিরে সোজা চলে গেছে সমুদ্রের ধারে। দূরে দূরে কারখানার চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দ্বীপগুলোর মানুষদের অধিকাংশই কালো। শক্ত, সমর্থ চেহারা। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সব সময় আনন্দে ডগমগ করছে। ক্যালিপসো গানের সুর ভেসে বেড়ায় এখানে সেখানে। কালো মানুষগুলোর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে হুল্লোড় করেন শ্বেতকায়রা। তাঁদের সঙ্গে আছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। আছেন চীনের মানুষরা। দ্বীপগুলোর মানুষদের প্রধান খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেটের নেশা আছে ওদের রক্তে। তাই প্রতিটি দ্বীপে ছড়িয়ে আছে ক্রিকেট মাঠ। ছোট থেকে আরম্ভ করে বড়রা পর্যন্ত সেখানে মেতে ওঠে, পাগল করা এই খেলা নিয়ে। যে যতো জোরে পারবে বল করবে, ব্যাটসম্যানের হাতে আছে ব্যাট— সেও যতো জোরে সম্ভব বল মারবে। আখছার তারা আঘাত পায়। কিন্তু গায়ে মাখে না। খুব কম বাচ্চা ছেলেকেই দেখা যাবে যার শরীরে ক্রিকেট বলের আঘাতের চিহ্ন নেই। ঐ আঘাতে আঘাতে তাদের শরীর আরো মজবুত হয়ে ওঠে। মন থেকে পালিয়ে যায় ভয়। তাই বড় হয়ে যখন তারা খেলতে নামে, তখন কিছুতেই ডরায় না। খেলাকে তারা খেলা হিসেবেই নেয়। হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার

বানিয়ে নিয়ে মার মেরে খেলে তারা। প্রতিটি বলই তাদের কাছে রান করার চ্যালেঞ্জ।

দ্বীপগুলোর নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ হয়। কখনো ত্রিনিদাদ যায় জামাইকায় খেলতে, কখনো বার্বাডোজ আসে ত্রিনিদাদে। আমাদের এখানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা হলে যে রকম হৈ-চৈ হয়, কারো মুখে খেলা ছাড়া আর কথাই থাকে না—ওদের ওখানে দ্বীপগুলোর মধ্যে ক্রিকেট খেলা হলে ঐ রকম অবস্থাই হয়। আনন্দ, হৈ-হট্টগোল আর মাতামাতির যেন আর সীমা থাকে না।

ঐ দ্বীপগুলোর একত্র নাম পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজ, জামাইকা, গায়না প্রভৃতি দ্বাপগুলোর সেরা খেলোয়াড়দের বেছে নিয়ে গড়া হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল।

ক্রিকেট বিশ্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটা আলাদা স্থান আছে। ইংলণ্ডের মত তারা নিজেদের ক্রিকেটের কুলীন বলে মনে করে না, অস্ট্রেলিয়ার মত ক্রিকেট খেলাকে তারা যুদ্ধ হিসেবে কোনদিন নেয়-নি। ক্রিকেট তাদের কাছে শুধু খেলাই। প্রাণের প্রিয় খেলা। ওদের খেলার রাজা ক্রিকেট।

সেই রাজাকে তাঁরা চিরকাল রাজাসনেই বসিয়েছেন। তাই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই স্যার গ্যারী সোবার্সের। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন এই অধিনায়ক অপরাজিত থেকে ৩৬৫ রান করে ভেঙে দিয়েছেন ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার লেন হাটনের রেকর্ড। ব্যক্তিগত সর্বাধিক উইকেট দখলের নজিরও ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই স্পিন বোলার ল্যান্স গিবসের। ৩০৯টি উইকেট লাভ করে গিবস ভেঙে দিয়েছেন ফ্রেডি ট্রুম্যানের রেকর্ড। পৃথিবীর একজন ব্যাটসম্যানই পরপর পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন। তিনিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়—ই. ডি. উইকস। পৃথিবীতে টাই টেস্ট খেলা হয়েছে মাত্র একটিই। সেটি খেলেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজই—অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। এই রকম হাজারো রেকর্ডে সমৃদ্ধ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটের ইতিহাস।

এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজই জন্ম দিয়েছে ওরেল, সোবার্স, কানহাই, উইকস, ওয়ালকটের মত ব্যাটসম্যানদের। হল, গিলক্রিস্ট রবার্টের মত ফার্স্ট বোলারদের। রামাধীন গিবসের মত স্পিন বোলারদের।

তাই ক্রিকেট বলতে যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বোঝায় তেমনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বলতে সকলে ক্রিকেট খেলার কথাই বোঝেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-ক্রিকেটের আদিপুরুষ স্যার লিয়ারি কনস্টেনস্টাইন থেকে আরম্ভ করে এখনকার অধিনায়ক লয়েড কিম্বা কালীচরণ পর্যন্ত সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন ক্রিকেট খেলাকে আরো আকর্ষণীয়, আরো জনপ্রিয় করে তুলতে। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ঠিকই। তাই আজ যদি প্রশ্ন তোলা হয় ক্রিকেট বিশ্বের সব থেকে 'স্পোর্টিং' অধিনায়ক কে—তাহলে সকলে একবাক্যে একটি নামই করবেন। তিনি আর কেউ নন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল।

এই ওরেলের নেতৃত্বেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টাই টেস্ট খেলেছিল। আমরা যদি সেই টেস্ট খেলাটির দিনগুলোর দিকে একবার চোখ বুলোই তাহলে একই সঙ্গে পেয়ে যাব ক্রিকেট বিশ্বের সামনের সারির ক'টি চরিত্রকে। সেই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল, গ্যারী সোবার্স, রোহান কানহাই, সনি রামাধিন, হাণ্ট, ওয়েসলি হল, ভ্যালেনটাইন। আর অন্যদিকে বেনো, হারভে, সিমসন, ওনীল, ম্যাকডোনাল্ড, ডেভিডসন, গ্রাউটরা।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে যা হয়ে গেছে বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে আর কোনদিন সেই রকম খেলা হবে কিনা সন্দেহ। ব্রিসবেন টেস্টের পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল একটি চিঠি পেয়েছিলেন। ঐ রকম শতশত চিঠি রোজ আসত, কিন্তু ঐ চিঠিটা পড়ে ওরেল স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। ছোট্ট চিঠি। মেলবোর্ণ থেকে এসেছে, তাতে লেখা ছিল :

'ফ্রাঙ্ক, আমি চোখে দেখতে পাই না। অনেক বছর অন্ধ। কিন্তু আমি আমার অন্ধত্বের জন্যে কখনো দুঃখ করি নি। অনুশোচনা করি

নি। কিন্তু আজ আমায় তাই করতে হলো। করতে হলো ব্রিসবেনে তোমাদের খেলা দেখতে পেলাম না বলে।

মেলবোর্ণের সেই অন্ধ মানুষটির মত দুঃখ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্রিকেট উৎসাহীদেরও। কারণ তাঁরাও দেখতে পাননি সেই খেলা। কেমন হয়েছিল সেই খেলা ? যার জন্যে এত দুঃখ ?

সেদিন ১৯৬০ সালের ৯ ডিসেম্বর। হাজার দশেক দর্শক এসেছেন ব্রিসবেন মাঠে। টসে জিতে ওরেল ব্যাট তুলে দিলেন হাণ্ট আর স্মিথের হাতে। অন্য দিকে আক্রমণ শানাতে বেনো ডেভিডসনের হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেক কাটতে না কাটতে ডেভিডসনের বলে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন হাণ্ট, স্মিথ আর কানহাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় উইকেট পড়ল ৬৫ রানে।

উইকেটে তখন সোবার্স। তখনো তিনি প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যাটস-ম্যানের স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু সেদিন সোবার্স অনন্য হয়ে উঠলেন। অস্ট্রেলিয়ার কোন বোলারকেই পরোয়া করেননি। ডেভিডসন, বেনোর আক্রমণ তিনি তছনছ করে দিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ উইকেট পড়ল ২৩৯ রানে। এবং সে উইকেট সোবার্সের। ১৩২ রান করে আউট হলেন। সোবার্স ছাড়া সেদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে নিটোল ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওয়েল (৬৫)। সোবার্স-ওরেল জুটি মাত্র ৪১ মিনিটে ৫০ রান পূর্ণ করল। তার মধ্যে সোবার্স ৪১ ও ওরেল ৯ রান করলেন। জুটির ১০০ রান এল ৯০ মিনিটে। সোবার্সের তখন ৬২ ওরেলের ৩৮। তারপর সোবার্সের সেঞ্চুরি। মাত্র ১২৫ মিনিটে ১৫টি বাউণ্ডারি হাঁকিয়ে। ১৩২ রান করে সোবার্স আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন। খেলেছেন ১৭৪ মিনিট। এর মধ্যে ২১ বার বল পাঠিয়েছিলেন সীমানার বাইরে।

এরপর জো সলোমন করলেন ৫৫ রান। দিনের শেষে আলেকজাণ্ডার ২১ রান করে অপরাজিত রইলেন। এবং প্রথম দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান উঠল ৭ উইকেটে ৩৫৯।

পরের দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আরো প্রায় একশ রান যোগ করল। আলেকজাণ্ডার ৬০ রান করলেন। আর হল ৬৯ মিনিটে ৫০ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ হল ৪৫৩ রানে। ৪৪৫ মিনিটে ৪৫৩ রান। ঘড়ির কাঁটা রইল পেছনে পড়ে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে তিন উইকেটে ১৯৬ রান করল। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চোখ ঝলসানো ব্যাটিংয়ের পাশে তাদের সেই খেলা বিরক্তিতে যেন নেতিয়ে পড়া। সিম্পসন ২৬০ মিনিটে ৯২, ম্যাকডোনাল্ড ১১১ মিনিটে ৫৫, হার্ভে ৬৩ মিনিটে ১৫ রান করলেন। আর ওনীল যাঁকে তখন দ্বিতীয় ব্র্যাডম্যান বলা হত তিনি ৮৯ মিনিটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ২৮ রান করে অপরাজিত রইলেন। নৈশ প্রহরী ফ্যাভেলের তখন ১ রান।

আগের দিনের ওনীলের সঙ্গে তৃতীয় দিনের ওনীল নামক মানুষটির আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেদিন তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্ষুরধার আক্রমণ—হল, ওরেল, সোবার্সের পেস আর রামাধীন, ভ্যালেনটাইনের স্পিন বলকে তিনি যেন চকিতে বশ করে ফেললেন। তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ফ্যাভেল আর ডেভিডসন।

ভাগ্যও সেদিন ওনীলের সঙ্গে ছিল। তাই বল উইকেটে লাগা সত্ত্বেও বেল পড়েনি (৫২ রানে), স্লিপে সোবার্স ক্যাচ ফেলে দিলেন ওরেলের বলে (৪৭ রানে), ভ্যালেনটাইনের বলে ক্যাচ লুফেও আলেকজাণ্ডার তা ধরে রাখতে পারলেন না (৫৪ রানে)। তিন-তিনবার জীবন ফিরে পেয়ে ওনীল হঠাৎই যেন নিজেকে ফিরে পেলেন। যে ওনীল ৫০ রান করতে ১৪৮ মিনিট নিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকেই বেরিয়ে আসতে লাগল বাউণ্ডারির পর বাউণ্ডারি।

এক সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ডিঙিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ উইকেটে ৪৬৯। ওনীল আর ডেভিডসন দারুণ খেলছেন। কিন্তু নতুন বল নিয়ে হল হঠাৎ ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। সকালে যাঁকে নেহাতই সাদামাঠা মনে হয়েছিল, বিকেলে তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন অসাধারণ।

মাত্র ৩৬ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার বাকী পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল। মেকিফ রান রাউট হলেন। ডেভিডসন (৪৪), বেনো, গ্রাউট আর ওনীলকে (১৮১) আউট করে দিলেন হল। হল মাত্র তিন ওভারে ৪টি উইকেট দখল করলেন ১৮ রান দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হল ৫০৫ রানে। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের ফলাফলে তারা এগিয়ে গেল ৫২ রানে।

চতুর্থ দিনটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার অলরাউণ্ডার ডেভিডসনের। সেদিন তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো যেন সাপের মত ছোবল তুলে আঘাত হানতে চলেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানদের। সকালেই তিনি কোলি স্মিথকে (৬) আউট করে দিলেন। তারপর সোবার্সকে (১৪)। কানহাই আর ওরেল সে আঘাত সামলে নিতে চেষ্টা করেও হার মানলেন। তুজনেই আউট হলেন ডেভিডসনের বলে। কানহাই (৫৪) আর ওরেল করলেন প্রথম ইনিংসের মত ৬৫ রান। তবু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রান তুলছিল ঝড়ের গতিতে। ৩০ মিনিটে ৩০ রান। ৪৮ মিনিটে ৫০, ৬০ মিনিটে ৭৫ ও ৯৮ মিনিটে ১০০ রান। শেষ পর্যন্ত ডেভিডসনের জন্যেই তারা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারেনি। সলোমন ৪৭ ও হাণ্ট ৩৯ রান করায় চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান উঠল ৯ উইকেটে ২০৯।

সেদিন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬০ সাল। দিনটির গর্ভে কি আছে তখনো কেউ জানে না। কি হবে সেদিন ? কি হতে চলেছে ? কিন্তু সকালে তার আঁচটিও পাওয়া যায়নি।

সকালে আরো ৪০ মিনিট ব্যাট করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৫৯ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করল। হল আর ভ্যালেনটাইন শেষ উইকেটে ২৫ রান যোগ করলেন। তুই ইনিংস মিলিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ৭৩৭। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংজে ৫০৫ রান করেছে। অর্থাৎ ২৩৩ রান করলেই অস্ট্রেলিয়া জিতবে। তাদের হাতে আছে দ্বিতীয় ইনিংসের সব কটি উইকেট এবং অঢেল (৩১০ মিনিট) সময়। পিচ ? না, পিচও ঠিক আছে। তাহলে অস্ট্রেলিয়ার জিৎ রুখবে কে ? অন্তত ড্র আটকাবার ক্ষমতা তো কারো নেই।

সত্যিই কি কারো নেই! মাথা ঝাঁকালেন ওয়েসলি হল। সাদা চকচকে দাঁতগুলো রোদে ঝলসে উঠল। মাটিতে তাল ঠুকে বললেন, আমার নাম হল—আমি দেখে নেবো। আমি দেখে নেবোই। নিলেনও ঠিক তাই। দ্বিতীয় ওভারে হলের আগুনে বল সিম্পসনের ব্যাটের গোড়ায় লেগে স্কোয়ার লেগের দিকে যেতেই বদলী খেলোয়াড় ল্যান্স গিবস সেটি ধরে ফেললেন। পরের ওভারে হার্ভের খোঁচা স্লিপে লুফতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোবার্স। তারপর ডিগবাজি খেয়ে সোবার্স যখন সোজা হলেন তখনো তাঁর হাতে ধরা আছে বলটা। কিন্তু আঙুল ভেঙে গেছে। তা যাক ক্ষতি নেই—হার্ভে তো আউট। অস্ট্রেলিয়ার হু উইকেটে ৭ রান। আর হলের ২ উইকেট ৬ রানে। হল তখন ভয়ঙ্কর। হিংস্রতার মূর্তি। পাঁচ ওভারে হু'জনকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ইনিংসের হিরো ওনীল এলেন। হলের প্রথম বল বাউন্সার। ওনীল বসে পড়লেন। বল তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বিহ্যুৎ বেগে ছুটে গেল। দীর্ঘ ২৪ মিনিট পরে তাঁর ব্যাট থেকে রান এল। লাঞ্চের আগের ৭০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া ২৮ রান করল হুটি উইকেট হারিয়ে। হলের ভয়ে ভীত ম্যাকডোনাল্ড পাঁজরে প্যাড বেঁধে ৭০ মিনিটে ১৪ আর ওনীল ৪৪ মিনিটে ৮ রান করেছেন।

বিরতির সময় ওনীল বোধ হয় ঠিক করে এসেছিলেন যে তিনি হাত খুলে মারবেন। শুরুও করলেন ঠিক সেইভাবে। ড্রাইভ করলেন, গ্লান্স করলেন। তারপর হলের বল লেটকাট করে বাউণ্ডারিতে পাঠালেন। ওরেল থার্ডম্যানে কাউকে রাখেন নি। ওনীল খুশী। কাট করে স্লিপদের ডিঙোতে পারলেই চার রান। হলের বলে আবার কাট করতে গেলেন। ঠিকমত মারতে পারলেন না। বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে উড়ে গেল। আলেকজাণ্ডার যেন তৈরি হয়েই ছিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি ধরে নিলেন। হলের তৃতীয় উইকেট ওনীল প্যাভেলিয়নের পথে পা বাড়ালেন। দীর্ঘ ৯১ মিনিট ধরে যাই যাই করে ম্যাকডোনাল্ড শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন। ওরেলের বলে বোল্ড। দেড় ঘণ্টায় তাঁর ঝুলিতে জুটেছে মাত্র ১৬টি রান।

ফ্যাভেল হলের প্রথম বলেই একচুলের জন্যে বেঁচে গেলেন। বলটা যেন স্টাম্প ছুঁয়ে চলে গেল। ওরেল সলোমনকে লেগের দিকে একটু সরিয়ে আনলেন। নির্দেশমত হল অফ স্টাম্পের বাইরে বল দিলেন। ফ্যাভেল স্কোয়ার কাট করে বাউণ্ডারি হাঁকালেন। তারপর আবার কাট করতে গিয়ে ফ্যাভেল বল তুলে দিলেন সলোমনের হাতে।

বেলা তখন দুটো কুড়ি। অস্ট্রেলিয়া ৫৭ রান তুলতেই পাঁচটি উইকেট হারিয়ে বসে আছে। হলের ৩৭ রানে ৪টি উইকেট। খেলার বাকী আর ২০০ মিনিট। অস্ট্রেলিয়াকে জিততে হলে করতে হবে ১৭৬ রান। তাও আবার শেষের পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে দিয়ে। অর্থাৎ জয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুঠোর মধ্যে। হল ক্ষেপে গেছেন। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দে নাচছেন। ওরেল তাঁকে সরিয়ে দিয়ে রামাধিনের হাতে বল তুলে দিলেন।

নতুন ব্যাটসম্যান ম্যাকে রামাধীনের প্রথম বলেই ক্যাচ তুললেন। বদলী খেলোয়াড় গিবস ফেলে দিলেন সেই ক্যাচ। ডেভিডসনের সঙ্গে জুটি বেঁধে সেই ম্যাকে জুড়ে দিলেন ৩৫ রান। ২৮ রান করে ম্যাকে রামাধীনের বলেই বোল্ড হয়ে ফিরে গেলেন। অধিনায়ক বেনো এসে যোগ দিলেন ডেভিডসনের সঙ্গে। বেনো মোটেই স্বচ্ছন্দ নন। তবু চা পানের সময় পর্যন্ত দুজনে টিঁকে রইলেন। ডেভিডসন ১৬ আর বেনো ৬ রান করে ফিরে এলেন। খেলার তখন আর ১২০ মিনিট বাকী। জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়াকে ১২৩ রান করতে হবে। হাতে আছে চারটি উইকেট। চা পানের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের গলায় ক্যালিপসোর সুর। উৎফুল্ল মুখ তাঁদের আর অন্যদিকে গম্ভীর মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো। তাঁর সামনে ভারী মুখে বসে আছেন অ্যালান ডেভিডসন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দেড় ঘণ্টা। খেলার চেহারা বদলে গেছে পুরোপুরি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের সেই খুশী খুশী মুখগুলো এখন থমথমে। অস্ট্রেলিয়ার শিবিরে আশার আলো। ডেভিডসন আর বেনো তখনো খেলছেন। অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে

২০৬ রান। খেলা শেষ হতে আর তিরিশ মিনিট বাকী। জেতার জন্যে তাদের ২৭ রান করতে হবে। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারবে। এই মুহূর্তে হার এড়াবার আর বোধহয় কোন উপায়ই নেই। সেকথা জানেন ওরেল। জানেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা। কিন্তু একজন তখনো সেকথা বিশ্বাস করেন না। লম্বা দোহারা চেহারা শক্তিতে ভরপুর খেলোয়াড়টি আত্মবিশ্বাসে টলমল করছেন। তিনি দুরন্ত ফাস্ট বোলার হল। ওরেল এবার তাঁর হাতে বল তুলে দিলেন! যাও বীর অসাধ্য সাধন করো।

কিন্তু হলের প্রথম বলে বেনো একটা রান নিলেন। পরের বল 'নো' ডাকলেন আম্পায়ার। ডেভিডসন ব্যাটে লাগিয়েই ছুটলেন। এক রান। পরের বল বেনো উঁচু করে লেগের দিকে মারলেন। হাণ্ট সেটি ধরে ফেরত পাঠাতে পাঠাতে ব্যাটসম্যানরা এক রান নিয়ে নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার আর দরকার ২৪ রান। সময় আছে ২৫ মিনিট। প্রতি বলে রান হওয়ায় রাগে ফুঁসছেন হল। পরের বল বাউন্সার। ডেভিডসন চকিতে হুক করলেন। সোজা চার। ওরেল এগিয়ে এসে হলের পিঠে হাত রেখে বললেন ওয়েস আর বাউন্সার দিও না।

হলের পরের বল বেনো পয়েণ্টের দিকে ঠেলে ছুটতে শুরু করলেন। ডেভিডসন 'নো, নো' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু ক্যাপটেনকে ছুটে আসতে দেখে তিনিও দৌড়লেন। ভ্যালেনটাইন বল ছুড়ে দিলেন আলেকজাণ্ডারের কাছে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার পারলেন না উইকেট ভাঙতে। নির্ঘাত রান-আউট হতে হতে বেঁচে গেলেন ডেভিডসন। সমস্ত মাঠ আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মন ভেঙে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের। খেলা শেষ হতে তখন আর ১৫ মিনিট বাকী। জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়াকে ১০ রান করতে হবে। হাতে আছে চারটি উইকেট।

সোবার্সের ওভার শেষ। হল আবার বল করতে চলেছেন। হলের বাম্পার বল বেনোর মুখের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠে চলে গেল। বল ফিরে পেয়ে হল চলেছেন তাঁর রান-আপের দিকে। দীর্ঘ পথ। দর্শকরা

চ্যাচাচ্ছেন হল তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো, হলের সেই ওভারে বেনো একটি রান নিলেন। কিন্তু কেটে গেছে পুরো পাঁচটি মিনিট।

ছটা বাজতে দশ। আর দশ মিনিট বাকী। দরকার ৯ রান।

সোবার্সের ওভার। দু দুটো রান হয়ে গেল। আর দরকার ৭ রান। জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু হঠাৎ......

একটা বল স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে বেনো রান নিতে গেলেন। ডেভিডসন তড়ি-মড়ি করে ছুটলেন। সলোমন মাটি থেকে বল তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন। উইকেট ভেঙে গেল। ডেভিডসন তখনো ক্রীজে পৌছুতে পারেননি। ডেভিডসন আউট। রান আউট। ৮০ রান করেছেন। অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের মুখ থেকে টেনে তুলে জয়ের পথে এগিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন ডেভিডসন। দুঃখ তাঁর জয়ের মুহূর্তে মাঠে থাকতে পারলেন না।

উইকেটরক্ষক গ্রাউট ব্যস্ত হয়ে এসে গার্ড নিয়ে দাঁড়ালেন। সময় বড় কম। ছয় মিনিটে ৭ রান করতে হবে। সোবার্সের সেই ওভারের আরো চারটি বল বাকী। সপ্তম বলে গ্রাউট রান নিলেন। কিন্তু হায় হায় করে উঠল সমস্ত মাঠ। পরের ওভার যে হলের। খেলার শেষ ওভারে হল তো ছেড়ে কথা কইবেন না। সুতরাং শেষ বলে বেনোকে রান নিতেই হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা তা হতে দেবেন না। ছয়জন এসে ঘিরে ধরলেন বেনোকে। আর সোবার্স! মন-প্রাণ এক করে দারুণ একটা বল দিলেন। পারলেন না বেনো। রান নেওয়া সম্ভব হল না। গ্রাউটকেই হলের মুখোমুখি হতে হবে।

ছটা বাজতে চার মিনিট। জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছয় রান। হলের শেষ ওভার। খেলারও। এই আটটি বলেই যা হয় হয়ে যাবে। হয় হার, না হয় তো......

পা টেনে টেনে হল এগিয়ে চলেছেন। এক হাতে বল। অন্য হাত দিয়ে বুকে ঝোলান ক্রসটা ছুঁয়ে আছেন।

হল দৌড়তে শুরু করলেন। গ্রাউটকে সেই মুহূর্তে অসহায় বলে

মনে হল। নিখুঁত লেংথের একটি বল। গ্রাউট ব্যাট চালালেন। বল ব্যাটে লাগল না, লাগল পেটে। পেট চেপে ধরে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন গ্রাউট। কিন্তু হঠাৎ দেখলেন বেনো ছুটে আসছেন। উপায় নেই। দম বন্ধ করে, পেট চেপে ধরে পড়ি-মড়ি করে গ্রাউট দৌড়লেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের নাকের ডগায় পড়ে রইল বল। হয়ে গেল একটি রান।

সাতটি বল বাকী। জয়ের জন্যে চাই পাঁচ রান।

মুখের শিকার সরে গেছে। হল রেগে আগুন। ওরেলের নিষেধ শুনলেন না। পঁয়ত্রিশ পা ছুটে এসে ছাড়লেন একটি বাউন্সার। বেনো হুক করতে গেলেন। বল তাঁর ব্যাটে লেগে শূন্যে। কৃতজ্ঞ আলেকজাণ্ডার বলটি লুফে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন আকাশে। সমস্ত মাঠ যেন লাফিয়ে উঠল। ১৩৬ মিনিটে ৫২ রান করে ফিরে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো।

তখনো ছয় বল বাকী। জয়ের জন্যে ৫ রান দরকার। হাতে আছে দুটি উইকেট। মেকিফ ব্যাট নিয়ে এগিয়ে আসছেন। প্যাড পরে প্যাভেলিয়নে একা বসে আছেন ক্লাইন।

হলের তৃতীয় বল মেকিফ আটকালেন। চতুর্থ বল ফসকালেন। উইকেটের অনেক পেছনে দাঁড়ানো আলেকজাণ্ডারের হাতে বল যেতে না যেতেই গ্রাউট ডাক দিয়ে ছুটে এসেছেন। তাই দেখে মেকিফ ছুটলেন। ফাঁকতালে রান হয়ে যাওয়ায় আরো রেগে গেলেন হল। আলেকজাণ্ডার বল ছুঁড়ে দিতেই হল সেটি উইকেটে ছুঁড়ে মারলেন। ভ্যালেনটাইন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওভার-থ্রো বাঁচালেন।

আর চারটি বল বাকী। জয়ের জন্যেও চাই চার রান।

হলের পঞ্চম বল। গ্রাউট চোখ বুজে ব্যাট চালালেন। লাগলেই বাউণ্ডারি এবং জিৎ। বল গ্রাউটের ব্যাটে লেগে আকাশে। মিড-অনে কানহাই ক্যাচ লোফার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আউট, গ্রাউট আউট। বল নেমে আসছে কানহাইয়ের হাতে। হঠাৎ হল লাফিয়ে পড়লেন কানহাইয়ের ওপর। কাউকে বিশ্বাস নেই। তিনিই ধরবেন ক্যাচ।

স্তম্ভিত কানহাই, স্তম্ভিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা। বল মাটিতে পড়ে গেছে। বেঁচে গেছেন গ্রাউট। আর সেই সুযোগে একটি রানও হয়ে গেছে।

হলের ষষ্ঠ বল। মেকিফ জোরে লেগের দিকে ব্যাট চালালেন। বল ব্যাটে লেগে উইকেটের দিকে ছুটে চলল। কেউ নেই সেখানে। সুতরাং বাউণ্ডারি এবং অস্ট্রেলিয়ার জিৎ।

কিন্তু কনরাড হাণ্ট বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলেছেন বলের দিকে। গ্রাউট আর মেকিফ রান নিচ্ছেন। দুটো রান হয়ে গেছে। তৃতীয় রান নেবার জন্যে ছুটলেন। হাণ্ট বাউণ্ডারি সীমার কাছ থেকে বল তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন উইকেট লক্ষ্য করে। বল ছুটে এল আলেকজাণ্ডারের হাতে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন উইকেটের ওপর। গ্রাউটও ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। আউট, গ্রাউট রান আউট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দুটো রান পেয়ে গেছে। তাদের রান তখন ৭৩৭। ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরও তাই।

তখনো হলের দুটি বল বাকী। এবং জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়াকে একটি রান করতে হবে।

হলের সপ্তম বল। ক্লাইন লেগের দিকে বলটা ঠেলে দৌড়তে শুরু করলেন। সলোমন চকিতে বলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন উইকেটে। ভেঙে গেল উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ। তারা দুই ইনিংস মিলে করেছে ৭৩৭ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজও তাই।

টাই খেলা, টাই।

বিশ্বের একমাত্র টাই টেস্ট্।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা দু হাত তুলে নাচছেন। নাচছেন না শুধু হল। তাঁর দুঃখ ওভারের শেষ বলটি তিনি করতে পারেননি। ঐ একটি বল যদি বাকী রয়ে না যেত তাহলে হয়তো সব কিছুই সমান সমান হত।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো তাঁর 'ওয়ে অফ ক্রিকেট'

বইতে লিখেছেন, 'ক্রিকেট সম্বন্ধে আমি যা বলতে চেয়েছি তার উপসংহার ঐ টাই টেস্টটি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।'

বেনো তাঁর বইতে এক জায়গায় লিখেছেন, 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমালোচনা করার কথা ভাবাই যায় না। খেলার প্রতি তাদের কি প্রচণ্ড আকর্ষণ, কি গৌরবময় খেলার ঢং তাদের।'

সত্যিই তাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা চিরকাল ক্রিকেটকে খেলা হিসেবেই নিয়েছেন। হার-জিৎ বড় কথা নয়, খেলাটা তাঁদের কাছে বড় কথা ছিল। কিন্তু আজকাল যেন সেই মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তাই আমরা দেখেছি, ১৯৭৬ সালে কিংসটনের চতুর্থ ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক লয়েডের অন্য মনোভাব। সেই টেস্টের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারত একটি করে টেস্টে জিতেছিল। তাই শেষ টেস্টটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু সেই টেস্টের শুরু থেকেই ভারত দারুণ খেলতে লাগলো। তাদের হারানো যখন সম্ভব মনে হল না তখনই লয়েড তাঁর ঝুলি থেকে বের করলেন মোক্ষম অস্ত্রটি। হোল্ডিং ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের শরীর লক্ষ্য করে বল ছুঁড়তে লাগলেন। আহত হলেন একাধিক ব্যাটসম্যান। শেষ পর্যন্ত সেই খেলায় ভারতের অধিনায়ক বেদী হার মেনে নিয়েছিলেন। যে দেশ টাই টেস্ট খেলেছে, যে দেশ স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের মত খেলোয়াড় পেয়েছে তাদের কাছ থেকে ঐ রকম আচরণ অপ্রত্যাশিত তো বটেই।

বিশ্বের একমাত্র টাই টেস্টের স্কোর বোর্ড

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম ইনিংস

কনরাড হান্ট ক বেনো ব ডেভিডসন	২৪
কোলি স্মিথ ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৭
রোহান কানহাই ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	১৫

গ্যারী সোবার্স ক ক্লাইন ব মেকিফ	১৩২
ফ্রাঙ্ক ওরেল ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৬৫
জো সলোমন হিট উইঃ ব সিম্পসন	৬৫
পি ল্যাসলি ক গ্রাউট ব ক্লাইন	১৯
আলেকজাণ্ডার ক ডেভিডসন ব ক্লাইন	৬০
সোনি রামাধীন ক হার্ভে ব ডেভিডসন	১২
ওয়েসলি হল স্টাঃ গ্রাউট ব ক্লাইন	৫০
এ ভ্যালেনটাইন নট আউট	০
আতরিক্ত	৪
মোট	৪৫৩

উইকেট পতন ঃ ১।২৩, ২।৪২, ৩।৬৫, ৪।২৩৯, ৫।২৪৩, ৬।২৮৩, ৭।৩৪০, ৮।৩৬৬, ৯।৪৫২

দ্বিতীয় ইনিংস

কনরাড হাণ্ট ক সিম্পসন ব ম্যাকে	৩৯
কোলি স্মিথ ক ওনীল ব ডেভিডসন	৬
রোহান কানহাই ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৫৪
গ্যারী সোবার্স ব ডেভিডসন	১৪
ফ্রাঙ্ক ওরেল ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৬৫
জো সলোমন এল বি ডবল্যু ব ডেভিডসন	৪৭
পি ল্যাসলি ব বেনো	০
আলেকজাণ্ডার ব বেনো	৫
সোনি রামাধীন ক হার্ভে ব সিম্পসন	৬
ওয়েসলি হল ব ডেভিডসন	১৮
এ ভ্যালেনটাইন নট আউট	৭
অতিরিক্ত	২৩
মোট	২৮৪

উইকেট পতন ঃ ১।১৩, ২।৮৮, ৩।১১৪, ৪।১২৭, ৫।২১০, ৬।২১০, ৭।২৪১, ৮।২৫০, ৯।২৫৩

বোলিং ঃ

ডেভিডসন	৩০-২-১৩৫-৫	ঃ	২৬.৬-৪-৮৭-৬
মেকিফ	১৮-০-১২৯-১	ঃ	৪-১-১৯-০
ম্যাকে	৩-০-১৫-০	ঃ	২১-৭-৫২-১
বেনো	২৪-৩-৯৩-০	ঃ	৩১-৬-৬৯-১
সিম্পসন	৮-০-২৫-১	ঃ	৭-২-১৮-২
ক্লাইন	৬-৬-৫২-৩	ঃ	৪-০-১৪-০
ওনীল	— — —	ঃ	১-০-২-০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঃ প্রথম ইনিংস ৪৫৩
দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৪
৭৩৭

অস্ট্রেলিয়া

প্রথম ইনিংস

সি ম্যাকডোনাল্ড ক হাণ্ট ব সোবার্স	৫৭
আর সিম্পসন ব রামাধীন	৯২
নীল হার্ভে ব ভ্যালেনটাইন	১৫
ওনীল ক ভ্যলেনটাইন ব হল	১৮১
এল ফ্যাভেল রান আউট	৪৫
কে ডি ম্যাকে ব সোবার্স	৩৫
অ্যালান ডেভিডসন ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৪৪
রিচি বেনো এল বি ডবল্যু ব হল	১০
গ্রাউট এল বি ডব্লু ব হল	৪
আই মেকিফ রান আউট	৪
এল ক্লাইন নট আউট	৩
অতিরিক্ত	১৫
মোট——	৫০৫

উইকেট পতন ঃ ১।৮৪, ২।১৩৮ ৩।১৯৪ ৪।২৭৮, ৫।৩৮১, ৬।৪৬৯ ৭।৪৮৪, ৮।৪৮৯, ৯।৪৯৬

দ্বিতীয় ইনিংস

সি ম্যাকডোনাল্ড ব ওরেল	১৬
আর সিম্পসন ক অতিরিক্ত ব হল	০
নীল হার্ভে ক সোবার্স ব হল	৫
ওনীল ক আলেকজাণ্ডার র হল	২৬
এল ফ্যাভেল ক সলোমন ব হল	৭
কে ডি ম্যাকে ব রামাধীন	২৮
অ্যালান ডেভিডসন রান আউট	৮০
রিচি বেনো ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৫২
গ্রাউট রান আউট	২
আই মেকিফ রান আউট	২
এল ক্লাইন নট আউট	০
অতিরিক্ত	১৪
মোট	২৩২

উইকেট পতন : ১।১, ২।৭, ৩।৪৯, ৪।৪৯, ৫।৫৭, ৬।৯২, ৭।২২৬ ৮।২২৮, ৯।২৩২

বোলিং :

হল	২৯·৩-১-১৪০-৪	:	১৭·৭-৩-৬৩-৫
ওরেল	৩০-০-৯৩-০	:	১৬-৩-৪১-১
সোবার্স	৩২-০-১১৫-২	:	৮-০-৩০-০
ভ্যালেনটাইন	২৪-৬-৮২-১	:	১০-৪-২৭-০
রামাধীন	১৫-১-৬০-১	:	১৭-৩-৫৭-১

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস ৫০৫

দ্বিতীয় ইনিংস ২৩২

৭৩৭

নাম তাঁর মার্টিন।

'বসার' মার্টিন।

একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের। কিন্তু দারুণ উইকেট বানাতেন। ওঁর হাতে পড়ে ওভালের চেহারাই তখন বদলে গেছে। মাঠ তো নয়, যেন মস্ত এক সবুজ-গালচে পাতা প্রাঙ্গণ। পিচটিও তেমনি সুন্দর। কিন্তু ঐ ব্যাটসম্যানদের ওপর একটু বোধহয় দুর্বলতা ছিল মার্টিনের। সেই দুর্বলতার ছাপই ফুটে উঠতো পিচে—এসো খেলো, যতো খুশী রাণ তোল। এই মাঠেই তো ব্রাডম্যান ১৯৩০ সালে ২৩২ আর ১৯৩৪ সালে ২৪৪ রাণ করেছিলেন। পনসফোর্ড অবশ্য পরে তাঁকে ডিঙিয়ে গিয়ে ২৬৬ রাণ করেছিলেন। তবে পনসফোর্ড আর ব্রাডম্যান দ্বিতীয় উইকেটে তুলেছিলেন ৪৫১ রাণ। পনসফোর্ড খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। আর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হয়ে ব্রাডম্যান আবার এসেছেন ইংলণ্ডে। এ সেই ১৯৩৮ সালের কথা।

নটিংহামে প্রথম টেস্ট ম্যাচের পিচ দেখে দু'দলের খেলোয়াড়রা বলেছিলেন—হ্যাঁ, একখানা পিচ বটে। এমনটি আর তাঁরা কোথাও দেখেননি। কথাটা মার্টিনের কানে গিয়েছিল। প্রথমটায় রেগে গেলেও পরে খেলোয়াড়দের ঐ মন্তব্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

তারপরে আবার আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টারও লাগলেন মার্টিনের পেছনে। আম্পায়ার হিসেবে চেস্টারের জগৎজোড়া নাম। চেস্টার আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের আম্পায়ারদের কাছে তিনি নমস্য, তিনি আদর্শ। চেস্টার এক সময় খেলোয়াড় ছিলেন। ভালোই খেলতেন। খেলোয়াড় হিসেবে অনেক উঁচুতে ওঠার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে তাঁকেও লড়তে হয়েছিল স্বদেশের

প্রয়োজনে। সেই যুদ্ধই ছিনিয়ে নিয়ে গেল চেস্টারের একটি হাত। খেলা ছাড়লেও খেলার মাঠ কিন্তু ছাড়লেন না ফ্রাঙ্ক চেস্টার। আম্পায়ার হিসেবে তিনি একদিন বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন।

সেবারের নটিংহাম টেস্টের পর ফ্রাঙ্ক চেস্টার এসেছেন ওভালে একটি কাউন্টি ম্যাচ খেলাতে। মার্টিনকে বেশ ভালো ভাবেই চিনতেন তিনি। তাই তাঁকে দেখেই টেন্ট ব্রিজের উইকেটের খুব প্রশংসা করতে শুরু করে দিলেন। কি সুন্দর পিচ। সত্যি খেলে আরাম আছে। ফ্রাঙ্ক চেস্টারের প্রশংসায় আরো ক্ষেপে গেলেন মার্টিন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দেবো কে ভালো পিচ বানাতে পারে।'

সেদিন ১৯৩৮ সালের ২০শে আগস্ট, শনিবার। সকাল এগারোটা পঁচিশ মিনিটে ফ্রাঙ্ক চেস্টার যখন অপর আম্পায়ার ওয়ালডেনকে নিয়ে ওভালের পিচের দিকে এগিয়ে এলেন তখন তিনি ঠিক জানতেন যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উইকেটটিই তিনি এবার দেখবেন। এবং মিনিট পাঁচেক পরেই সেই পিচে শুরু হবে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট ম্যাচ। এবং চলবে যতোদিন ধরে চলে।

ঠিক তাই। একশ গজ দূরে বসা দর্শকরাও দেখলেন বাইশ গজ লম্বা, পাঁচ গজ চওড়া জায়গাটার ওপর সকালের সোনালী রোদ যেন পিছলে পড়ছে। চেস্টার মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, সেদিন মার্টিনের পেছনে লেগে ভালোই হয়েছে। কি পিচই না বানিয়েছে মার্টিন। রানে রানে ভরে আছে। টসে জিতেছে ইংলণ্ড। আগে ব্যাট করবে তারা। এই সুযোগটাই তাদের দরকার ছিল সব থেকে বেশী।

কারণ সেবার ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দুটি টেস্ট অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছিল। বৃষ্টির জন্যে ম্যানচেস্টারের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ একেবারেই হতে পারেনি। লীডসের চতুর্থ টেস্টে হাটন আর এমস খেলতে পারেননি। দুজনেই আহত ছিলেন। ও'রিলি আর স্মিথ তছনছ করে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের ইনিংস। এডরিচ, বারনেট,

হার্ডস্টাফ, হ্যামণ্ড, পেণ্টার আর কম্পটন হাজার চেষ্টা করেও ইংলণ্ডের ইনিংসকে ১২৩-এর বেশী টেনে নিয়ে যেতে পারেননি। ওরিলি পাঁচটি আর স্মিথ চারটি উইকেট পেয়েছিলেন। আর অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ১০৭ রানে। এই হারের যোগ্য জবাব দিতে হলে ওভালের শেষ টেস্টে ইংলণ্ডকে জিততেই হবে। আর এই টেস্টের মীমাংসা হবেই। কারণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলাটা চলবে।

ইংলণ্ড দলেও কিছুটা অদল-বদল করা হয়েছিল। এমসের আঙুলের ব্যথা পুরো সারেনি। শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দিয়ে উডকে দলভুক্ত করা হলো। চল্লিশ বছর বয়সে আর্থার উড তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন। আর সেই জন্যে তাঁকে পাঁচ পাউণ্ড খরচ করে ইয়র্কশায়ার থেকে ট্যাক্সিতে চেপে ওভালে আসতে হলো।

আঙুল ভাঙার পর লেন হাটন মাত্র দুটি ইনিংস খেলেছেন এবং দুবারই ব্যর্থ হয়েছেন। তবু তাঁকে দলে নেওয়া হলো। বারনেট বাদ পড়লেন। তাঁর জায়গায় এলেন এডরিচ। যদিও তিনি আগের টেস্টগুলিতে করেছেন মাত্র ৫, ০, ১০, ১২ ও ২৮ রাণ। লেল্যাণ্ডকে ৩৮ বছর বয়েসে টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হলো। হ্যামণ্ড, পেণ্টার, কম্পটনের নির্বাচনে কোন প্রশ্ন ছিল না। হার্ডস্টাফ মারকুটে খেলোয়াড়। সাত নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি নামবেন। আর আছেন উড, ভেরিটী, ফারনেস ও বোওস।

পর পর তিনটি টেস্টে টসে হারার পর ব্রাডম্যান ধরেই নিয়েছিলেন যে ওভালে তিনি জিতবেনই। তাই হ্যামণ্ডের সঙ্গে যখন টস করতে এলেন তখন তাঁর পরনে 'লাউঞ্জ স্যুট'। হ্যামণ্ড ঠিক ততোটা আত্ম-বিশ্বাসী নন। খেলার পোশাকের ওপর ব্লেজার চড়িয়ে তিনি মাঠে এলেন। 'বসার' মার্টিন মাঠেই ছিলেন। দুই অধিনায়ককে দেখে এগিয়ে এলেন। পিচ দেখিয়ে বললেন, "ক্রিস্টমাস পর্যন্ত এই পিচ টিঁকে থাকবে। কোন খুঁত খুঁজে পাবেন না। খেলুন যতোদিন খুশী।"

শুনে ব্রডম্যান হাসলেন। হ্যামণ্ডকে মনে হল একটু চিন্তিত।

হ্যামণ্ডই পয়সাটা আঙ্‌ুলের ওপর আঙ্‌ুল রেখে ওপরে তুললেন। সেদিকে একবার তাকিয়ে ব্রাডম্যান বললেন,

"হেড...."

পয়সাটা মাটিতে পড়তেই হ্যামণ্ড দেখলেন "টেল"। নিজের চোখকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাঁর মনে হল ঐ পিচে শ ছয়েক রাণ করতে পারবেন তাঁরা।

ব্রাডম্যান আগেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পেছনে এসে সাজঘরে ঢুকে হ্যামণ্ড প্যাড পরতে বললেন হাটন আর এডরিচকে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন,

"দেখো এটা 'টাইমলেস টেস্ট', অনেকদিন ধরে চলবে। আমি তোমাদের পিচে দেখতে চাই মধ্যাহ্নভোজ এমন কি চা পানের বিরতির পরেও..."

ইয়র্কশায়ারের বাইশ বছরের লেন হাটনের প্যাড পরতে পরতে মনে পড়লো আট বছর আগের কথা। লীডস টেস্টে সেবার তিনি ব্রাডম্যানকে ৩৩৪ রাণ করতে দেখেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রাণ। সেই ১৪ বছর বয়স থেকেই লেন হাটন স্বপ্ন দেখে আসছেন ব্রাডম্যানের ঐ ৩৩৪ রাণের রেকর্ড ভাঙার। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁর জীবনে সুযোগ সে দিনই আসবে। এই টেস্টে সময়ের কোন সীমা নেই। যতোদিন ধরে চলে চলবে খেলাটা। সেই খেলাতেই তিনি চলেছেন ইংলণ্ডের ইনিংসের সূচনা করতে। এমন সুযোগ তাঁর জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। ব্রাডম্যানের নজির যদি ডিঙোতে হয় কোনদিন তাহলে তাঁকে এবারই তা করতে হবে।

প্যাড বাঁধতে অনেক সময় নিচ্ছিলেন হাটন। ইচ্ছে করেই। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। ডান হাতের মাঝের আঙ্‌ুলটায় এখনো ব্যথা আছে। সাবধানে খেলতে হবে। যাতে ঐ আঙ্‌ুলে আবার চোট না লাগে। এক মাস আগে লর্ডস মাঠের সেই ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। খেলা ছিল মিডলসেক্সের সঙ্গে। ওদের ক্যাপ্টেন রবিনস টসে জিতে ইয়র্কশায়ারকে ব্যাট করতে

পাঠালেন বৃষ্টি ভেজা উইকেটে। ঐ পিচে ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে খেলা সত্যিই কষ্টকর। আঘাত লাগার ভয় প্রতি পদে পদে। হলোও ঠিক তাই। ইয়র্কশায়ারের তিনজন খেলোয়াড় আহত হলেন। আঙুল ভাঙলো হাটনের। ফলে তিন সপ্তাহ খেলতে পারলেন না তিনি। আর ইয়র্কশায়ারকে প্রথম হার স্বীকার করতে হল ঐ খেলায়।

তিন সপ্তাহ খেলতে না পারায় হাটনের উপকারই হয়েছে। বিশ্রামের বড় দরকার ছিল তাঁর। খেলতে খেলতে তিনি বড্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ওজন কমে গিয়েছিল। হাটন বেশ বুঝতে পারছিলেন ঐ তিন সপ্তাহ তাঁকে অনেক সুস্থ করে তুলেছে। তাঁর আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।

বিল এডরিচ একটু অবাকই হয়েছিলেন। লেনের তো কখনো এতো সময় লাগে না! ওঁর তো সেই কখন হয়ে গেছে। ব্যাট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাও মাঠে নেমে পড়েছেন।

বিল এগিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি রেডি লেন?"

"হ্যাঁ..."

উঠে দাঁড়ালেন হাটন।

তারপর ব্যাট হাতে নিয়ে প্যাভেলিয়ন ছেড়ে দুজনে নেমে এলেন মাঠে। সময়হীন শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে...।

যে কোন টেস্ট ম্যাচের শুরুটাই বেশী উত্তেজনাপূর্ণ। আর প্যাভেলিয়ন থেকে হাজার হাজার দর্শকের দৃষ্টি মাড়িয়ে পঁচাত্তর গজ হেঁটে ইনিংসের গোড়া-পত্তন করতে যাওয়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

যতোক্ষণ না একটা বল ব্যাটের ঠিক মধ্যিখানে লাগছে ততোক্ষণ আশানিরাশার দোলায় দুলতে থাকে মন।

লেন কিন্তু এবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড তিনি ভাঙবেনই। হাতে আছে অনন্ত সময়। আর আছে রানে ভরা পিচ। লেন দেখলেন ওয়েট বল করতে যাচ্ছেন প্যাভেলিয়নের দিক থেকে। অন্য দিক থেকে করবেন ম্যাককেব।

ওয়েটের প্রথম ওভারে হাটন কোন রান নিলেন না। ম্যাককেবের শেষ বলটা মিডঅনের পাশ দিয়ে ঠেলে এডরিচ একটা রান নিলেন। বল বেশ উঁচু হয়েই যাচ্ছে। এবং দুজনের বলই বাঁক খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা বলগুলো দেখে শুনে খেলার মতো যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন।

আম্পায়ারের কাছ থেকে কাউন্টিটা নিতে গিয়ে ম্যাককেব বললেন,

"ফ্রাঙ্ক ওরা হাজার রান করবে।"

ইংলণ্ডের অধিনায়ক হ্যামণ্ডও ঠিক তাই-ই চাইছিলেন।

বলের কোন ধারই নেই। কিন্তু দুজন বোলারই নিখুঁত নিশানায় বল করছিলেন এবং ব্যাটসম্যানদের খেলতে বাধ্য করছিলেন। পনেরো মিনিটে সাত রাণ উঠলো। ম্যাককেবের সপ্তম ওভার। দিনের অষ্টম। পা বাড়িয়ে একটা বল লেগের দিকে ঘুরিয়ে হাটন রান নিলেন। একই ভাবে মেরে এডরিচ পেলেন তিন রাণ। আর পরের বলটা হাটন সুন্দর ভাবে লেট-কাট করলেন। দ্বিতীয় স্লিপের পাশ দিয়ে বলটা চলে গেলো বাউণ্ডারীতে। দিনের প্রথম চার। বলটা মেরে খুশীই হলেন হাটন। হ্যাঁ, তিনি ঠিক ভাবেই বল দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল অনেকখানি।

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল। দলের রান তখন ২০। ও'রিলি এলেন ওয়েটের জায়গায় বল করতে। দুজনকে সর্ট লেগে এনে দাঁড় করালেন ব্র্যাডম্যান। ব্যাট থেকে গজ ছ'য়েক দূরে দাঁড়ালেন ওঁরা। দর্শকরা একটু নড়েচড়ে বসলেন। এইবার আসল খেলা শুরু হলো। ব্যাট বলের লড়াই।

ও'রিলির প্রথম বল। হাটন যেন চোখ বুজে ব্যাট চালালেন।

দর্শকরা থ। তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে লেন ঐভাবে খেলবেন। বলটা মিডঅনের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়লো। লেন আর বিল তুটো রান নিলেন। তারপরই দর্শকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে দেখলেন যে আম্পায়ার 'নো বলে'র ইশারা দিচ্ছেন।

প্রথম বলটা নো। ও'রিলি দারুণ চটে গেছেন। পরের বলটা যতোটা সম্ভব জোরে দিলেন। হাটনও সুন্দর 'গ্লান্স' করে বলটা বাউণ্ডারিতে পাঠালেন। হাটন জানতেন যে মার খেলেই ও'রিলি পরের বলটা তুরন্ত জোরে দিয়ে থাকেন।

ব্যাটসম্যানদ্বয় হাত জমিয়ে ফেলার আগেই ব্র্যাডম্যান তাঁর স্পিনারদের একবার সুযোগ দিতে চাইলেন। ম্যাককেবের জায়গায় বল করতে এলেন স্মিথ। ন্যাটা বোলার। অনেকটা করে বল ঘুরোতে পারেন। একটা গুগলি দিলেন। কিন্তু তেমন ঘুরলো না সেটা। অপর প্রান্তে ও'রিলি ভালোই বল করছেন।

স্মিথের পরের ওভারে বিল একটা হাভ ভলি মেরে তিন রান নিলেন। কিন্তু ঐ তিন রান তাঁকে ও'রিলির মুখোমুখি করে দিল। এই মরশুমে ও'রিলি তাঁকে ছ'ছবার আউট করে দিয়েছেন। দর্শকরা ইতিমধ্যেই তাঁকে ও'রিলির শিকার বলতে শুরু করেছে। ও'রিলি এডরিচকে বল করতে আসছেন। স্বভাবতই মাঠে উত্তেজনা। এবার কি বিল ও'রিলিকে খেলতে পারবেন ?

ও'রিলি তাঁর লম্বা দৌড় শুরু করেছেন। এডরিচ দেখলেন বলটা তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এলো। এডরিচ একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর পিছিয়ে এলেন স্টাম্পের দিকে। বল এসে গেছে। আর তখনই বুঝলেন যে তিনি ভুল করেছেন। তাঁর এগিয়ে গিয়ে খেলা উচিত ছিল। এডরিচ দেখলেন, বলটা একটু ঘুরলো। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাট নামালেন। কিন্তু তার আগেই সেটা এসে লাগলো তাঁর প্যাডে।

হাউজ দ্যাট..........

তু হাত মাথার ওপর তুলে ও'রিলি নেচে উঠলেন। আম্পায়ারের

আঙুল ততোক্ষণে উঠে গেছে ওপরে। শুকনো মুখে এডরিচ পা বাড়ালেন প্যাভেলিয়নের পথে।

লেল্যাণ্ড এসেই স্মিথের বলে একটা রান নিলেন। ও'রিলির পরের ওভারে একটি গুগলি বল হাটন খুব জোরে ঘোরালেন লেগের দিকে। সর্ট লেগের ফিল্ডার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁকে ফাঁকি দিয়ে বলটা চলে গেল বাউণ্ডারীতে। ও'রিলির আর একটা নো বল লেল্যাণ্ড অনেক উঁচু করে বোলারের পেছনে মারলেন। ও'রিলি দারুণ চটে গেলেন। ফাস্ট বোলারদের মত ছুটে এসে পরের বলটা দিলেন। বলটা মারাত্মকভাবে লাফিয়ে উঠলো। লেল্যাণ্ড মাথা নীচু করলেন। কিন্তু তাঁর ক্যাপটা উড়িয়ে দিল বলটা। উইকেটের কাছে পড়লো সেটি। আর একটু হলেই উইকেট ভেঙে দিতে পারতো এবং লেল্যাণ্ড আউট হয়ে যেতেন।

ও'রিলির বদলে ওয়েটকে আবার বল করতে পাঠালেন ব্র্যাডম্যান। দুজনেই খুব সহজ ভাবে খেলছিলেন। হাটন কখনো কভারে ড্রাইভ করছিলেন, লেগের দিকে বল ঘুরোচ্ছিলেন কিম্বা কার্ট করছিলেন। আর লেল্যাণ্ড জোরে জোরে মারছিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ইংলণ্ডের রান এক উইকেটে ৮৯। হাটন ৩৯ রানে অপরাজিত।

বিরতির পর হাটন আর লেল্যাণ্ড মাঠে নামছে। এই সময়টাই বিশ্রী। বিরতির পরের কয়েকটা ওভার বড়ই মারাত্মক।

"এইভাবেই খেলে যাও লেন···"

হাঁটতে হাঁটতে বললেন লেল্যাণ্ড।

হাটন মাথা নাড়লেন। এই সময়টা হাটনের খুব খারাপ লাগে। প্যাভেলিয়নের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে থেকে এসে আবার মনস্থির করা।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর একটি রান করার পরই হাটন গেলেন স্মিথের একটা বল মারতে। ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। বলটা লাফিয়ে উঠলো। তিনি ফস্কালেন। উইকেটরক্ষক বার্ণেটও

ঠিক ভাবে ধরতে পারলেন না। হাটন তাড়াতাড়ি ক্রীজে ফিরে এলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে নিলেন যে আর ক্রীজ ছাড়বেন না।

দ্রুত রান উঠতে লাগলো। কোন ব্যাটসম্যানেরই এতোটুকুও অসুবিধে হচ্ছে না। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে রান উঠছে। দু'শ রান না হওয়া পর্যন্ত আর নতুন বল পাওয়া যাবে না। টসে হারার দুঃখটা আর একবার উথলে উঠলো ব্রাডম্যানের।

হাটনের সেই ভাঙা আঙুলটায় আবার ব্যথা করছে। বেশ ফুলে উঠেছে। উপায় নেই। ঐ আঙুল নিয়েই হাটনকে খেলে যেতে হবে।

ব্রাডম্যানের মুখ চিন্তায় ভার। কি করা যায়? কিভাবে এদের আউট করা যায়? কোন ভাবে কি এদের একজনকে রান আউট করা যায় না? একজন না হয় আউটই হলো। তাতেই বা কি? আসবেন হ্যামণ্ড, পেণ্টার, কম্পটন, হার্ডস্টাফ···ওরা তো এক সপ্তাহ ধরে ব্যাট করবে···।

বলে ধার যদি বাড়ানো যায়—এই কথা ভেবে ওয়েট গেলেন 'রাউণ্ড দি উইকেট' বল করতে। কিন্তু কিছুই তাতে এলো-গেলো না। দুজনেই দিব্যি মেরে খেলে রান তুলতে লাগলেন।

অবস্থা এমনই হল যে সিডনি বার্নসকেও বল করতে ডাকলেন ব্র্যাডম্যান। ব্র্যাডম্যান বার্নসকে নেটে লেগ ব্রেক বল করতে দেখেছিলেন। সফরের কোন খেলাতেই বার্নস বল করেননি। ব্যক্তিগত ৬৩ রানের মাথায় লেল্যাণ্ড একবার 'স্টাম্পড' হতে হতে বেঁচে গেলেন।

স্মিথ-ও'রিলি যতোই চেষ্টা করুন, যতোই পরিশ্রম করুন—হাটনের ব্যাট থেকে ছুটে যাওয়া বলগুলো অনেক রানই এনে দিচ্ছিলো। এবং দেখতে দেখতে হাটন এক সময় ৯০-এর ঘরে পৌঁছে গেলেন। ব্র্যাডম্যান ঘিরে ধরলেন তাঁকে। এই সময়টা মনের ওপর চাপ দিয়ে যদি তাঁকে আউট করা যায়। কিন্তু কে কার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে?

একটি অফ ড্রাইভ ও লেগের দিকে একটি জোরালো মার হাটনকে

শতরানের গণ্ডী পার করে দিল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রানও পার হয়ে গেল দু'শর কোঠা। একটু পরেই লেল্যাণ্ডও শতরান পূর্ণ করলেন।

আকাশে তখন মেঘে মেঘ।

চা পানের বিরতি। দুই সেঞ্চুরীকারী ব্যাটসম্যান হাটন আর লেল্যাণ্ড ফিরে গেছেন প্যাভেলিয়নে—চায়ের কাপে কিছুটা বিশ্রাম নিতে। দর্শকরা স্টলে স্টলে গলা ভিজোচ্ছেন।

তখনই আচমকা এলো বৃষ্টি। আকাশ ভাঙা বৃষ্টি···।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ব্যাটসম্যানদের মুখ চেয়ে মার্টিনের গড়া ঐ পিচের ওপর এই আচমকা বৃষ্টি একটুও প্রভাব বিস্তার করবে না? আর কেউ না হলেও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ব্রাডম্যান অন্তত আশাবাদী। তাই ওয়েট আর ও'রিলিকেই দিলেন আক্রমণ শানাবার ভার।

ওয়েটের প্রথম বল হাটনের মাথার টুপির পাশ দিয়ে উড়ে গেল দুরন্ত গতিতে। অপর প্রান্তে ও'রিলির বল এসে আঘাত করলো তাঁর হাতের মুঠোয়।

ঐ একটা দুটো ওভার। তারপর ওভারের পর ওভার কেটে যাচ্ছে, একটি বলও বোকা বানাতে পারছে না ব্যাটসম্যানদ্বয়কে। আর পিচ সকালে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। বৃষ্টি পিচের ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। শুধু আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব্যাটসম্যানরা বুঝি আরো তাজা হয়ে উঠলেন।

স্মিথ আর ও'রিলি সারাদিন ধরে চেষ্টা করে গেলেন। হাটন একমুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হলেন না। ওভার পিচ বলগুলো তাঁর ব্যাটের ছোঁয়ায় ছুটে গেলো বাউণ্ডারীর দিকে। আবার কতকগুলো বল নিখুঁতভাবে গ্লান্স করে তিনি রান আদায় করে নিলেন। নিপুণ হাতে মারা অফ ড্রাইভ আর কাট করা ছাড়াও তিনি বোলার ও

ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে বল তুলে মারতে লাগলেন। এই মারগুলোই সকলকে বুঝিয়ে দিল যে হাটন তখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

কিন্তু ঐ রকমভাবে একটা বল উঁচু করে মারার পরই হাটনের চোখ পড়লো প্যাভেলিয়নে ব্যালকনির দিকে। হ্যামণ্ড তাঁর দিকে হাত নেড়ে নেড়ে ইশারা করছেন। হ্যামণ্ড কি বোঝাতে চাইছেন তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না হাটনের। সারাদিন হাটন উইকেটে আছেন। ক্লান্ত তিনি। ঐ ভাবে উঁচু করে মারতে গিয়ে সময়ের সামান্য হেরফের হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। হ্যামণ্ড চান না যে শেষ বিকেলে হাটন আউট হয়ে ফিরে আসুন। তাহ'লে হয়তো প্রথম দিনের শেষ আধঘণ্টায় স্মিথ আর ও'রিলি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের মনোবাঞ্ছা কিছুটা পূরণ করে দিতে পারবেন আরো দু তিনটে উইকেট দখল করে। তা ছাড়া কোন খেলোয়াড়ই সন্ধ্যের মুখে ব্যাট করতে আসতে চান না। হ্যামণ্ড প্যাড পরে বসে আছেন। তিনি চাইছেন না বিকেলের দিকে ব্যাট করতে আসতে।

তাই হাটন তাঁর খেলার ধারা বদলে ফেললেন। মারার বল পেলে শুধু অফের দিকেই মারতে লাগলেন তাও খুব দেখে শুনে। সারাদিনের ক্লান্তি অনেক সময় ব্যাটসম্যানকে আচমকাই ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে। ব্র্যাডম্যান যে মুহূর্তটির দিকে চেয়েই সারাটা দিন কাটিয়েছেন সমাগত সেই সময়।

ওয়েটের একটা বল এক্সট্রা কভারে মেরে লেল্যাণ্ড দৌড়তে শুরু করলেন। হাটন সহজেই পৌঁছে গেলেন অপর প্রান্তে। কিন্তু ব্যাডকক বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে বলটা ধরেই ছুঁড়ে দিলেন বোলারের দিকে। ব্যাডকককে বলটা তাঁর দিকে ছুড়তে দেখে ওয়েট তাড়াহুড়ো করে উইকেটের দিকে ছুটে এলেন। মুহূর্তের মধ্যে বলটা এসে গেল। কিন্তু ওয়েট তাঁর ভারসাম্য তখন আর বজায় রাখতে পারলেন না। বল হাতে পাওয়ার আগেই ভেঙে দিলেন উইকেট।

একটি মূল্যবান উইকেট দখলের সহজ সুযোগ হারিয়ে হতাশায়

ভেঙে পড়তে চাইলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা। কিন্তু হাল ছাড়লেন না। বার্নসের লেগ ব্রেক বার কয়েক ফস্কালেন লেল্যাণ্ড।

এই সময় হাটন একবার দারুণ লেট কাট করলেন। বলটা প্রায় উইকেটরক্ষকের হাতে পোঁছে গিয়েছিল। সেই বলটা কাট করলেন হাটন। তাঁর ব্যাটের তলাটা প্রায় উইকেটরক্ষকের গ্লাভস ছুঁয়ে চলে এলো। তারপর বাকী সময়টা বল করে গেলেন ও'রিলি আর স্মিথ। দুজনেই দারুণ পরিশ্রান্ত। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাদের প্রত্যেকটি বল প্রথম ওভারের মতো লেংথ ও নিশানায় ছিল নিখুঁত।

প্রথম দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান এক উইকেটে ৩৪৭। হাটন ১৬০ ও লেল্যাণ্ড ১৫৬ রানে অপরাজিত। ওঁরা দুজনে দ্বিতীয় উইকেটের সব রেকর্ড ইতিমধ্যেই ভেঙে দিয়েছেন। আর মাত্র পাঁচ রান করতে পারলেই ওঁরা ভেঙে দেবেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন উইকেটের রেকর্ড। ১৯১২ সালে হবস আর রোডস মেলবোর্ণে ৩২৩ রান করে সেই নজীর গড়েছিলেন।

পরের দিন রবিবার। খেলা নেই। বিশ্রাম। তাই সকলেরই মনে খুশী খুশী ভাব। সময়হীন টেস্টের প্রথম দিনটা তো ভালোয় ভালোয় কেটে গেল।

মেরিলিবোন স্টেশনের গায় গ্রেট সেণ্ট্রাল হোটেল। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা ওখানেই আছেন। কেউ কেউ সন্ধ্যের শোয় সিনেমা দেখতে গেলেন। হাটন হোটেলেই রইলেন। একটু আড়মোড়া ভাঙতে হবে। বিশ্রামও দরকার। তাছাড়া ভেরিটি আছেন। ওঁর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করলে উপকারই হবে। অভিজ্ঞ ভেরিটির ক্রিকেটে জ্ঞান দারুণ। বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা কোথায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন।

এ কিন্তু নতুন কিছু নয়। সেই ১৬ বছর বয়েস থেকে তিনি ইয়র্কশায়ারের পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে সময় পেলেই ক্রিকেট নিয়ে কথা বলে আসছেন। হাটন তখন মাইনর কাউন্টিতে ইয়র্কশায়ারের দু নম্বর দলের হয়ে খেলতেন। তবে সব সময়ই যে এঁরা ঠিক ঠিক

কথা বলেন তা নয়। কেউ কেউ তো কিছু বলতেই চান না। তবে ইয়র্কশায়ারের কর্মকর্তারা তাঁকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। আসলে তাঁর ওপর ওঁদের নজর ছিল। এবং তা বোঝা গেলো ১৯৩৪ সালে তিনি যখন সবে আঠারোর ঘরে পা দিয়েছেন। হাটন ইয়র্কশায়ারের পক্ষে খেলার সুযোগ পেলেন। এবং অচিরেই তাঁকে দেখা গেলো হারবার্ট সার্টক্লিফের সঙ্গে দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে।

কিন্তু তারপরই হাটনের দারুণ শরীর খারাপ হলো। ১৯৩৫ সালে মোটে খেলতেই পারলেন না। কিন্তু পরের বছর হাজার রান করলেন। আর তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে তিনি পেলেন প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ। প্রথম টেস্টে শূন্য করলেও তারপর সেঞ্চুরি করে তিনি তাঁর স্থানটা পাকা করে নিলেন। মিডলসেক্সের সঙ্গে খেলার সময় আহত হবার আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ইনিংসের গোড়াপত্তন করার জন্যে তাঁর স্থানটি ছিল বাঁধা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় হোটেলের লাউঞ্জে ভেরিটির পাশে বসে গল্প করছিলেন হাটন। হাতে তাঁর অরেঞ্জ স্কোয়াস। মদটদ তো দূরের কথা জীবনে কোন দিন সিগারেটও খাননি হাটন। ভেরিটির সঙ্গে গল্পটল্প করে তাড়াতড়ি শুয়ে পড়লেন হাটন। পাক্কা দশ ঘণ্টা ঘুমোলেন।

রবিবার সকালে ভেরিটির সঙ্গে বগনরে গেলেন। ইয়র্কশায়ারের বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে খাওয়াদাওয়া করলেন। ছুটির দিন। বাড়িতে আর কে থাকে। সক্কলে বেরিয়ে পড়েছে। বালির ওপর ক্রিকেট খেলছে ছোটরা। বড়রাও ওদের সঙ্গে। চারদিকে খুশী খুশী ভাব। ওভাল মাঠের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন হাটন। বালির ওপর মেতে উঠলেন ক্রিকেট খেলায়। কেউ চিনতেও পারলো না তাঁকে। কেউ জানলোও না যে এই ছেলেটিই আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬০ রান করেছে। আবার পরের দিন সকালেই সে তার অপরাজিত ইনিংস শুরু করবে। দিব্যি মজা করে কেটে গেলো ছুটির দিন রবিবারটা।

কিন্তু সোমবার সকালে হাটনের অন্য চেহারা। একদিনের বিশ্রাম তাঁকে আরো চাঙ্গা করে তুলেছে। মনোবল আর আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে। সকাল সকাল 'ব্রেকফাস্ট' সেরে হাটন চলে এলেন ওভালে। তারপর অনুশীলন। বোলার ভেরিটি।

সাটক্লিফের একটা কথা হাটন সব সময় মেনে চলতেন।

সাটক্লিফ বলতেন, সবার আগে চোখটাকে ঠিক করে নিতে হবে। আগের দিন অপরাজিত থাকলে তো আর কথাই নেই। অনেক বেশী সতর্ক হয়ে খেলা শুরু করতে হবে। আসলে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—আগের দিন যেখানে শেষ করে গিয়েছিলে সেখান থেকেই আবার শুরু করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া।

সেদিন সকালটা সোনালী রোদে ঝলমল করছে ঠিকই—কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা। অনুশীলন করার সময় হাটন তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। আশে-পাশে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে বোধ হয়। তাই ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তার মানে এখানেও বৃষ্টি হতে পারে।

হাটন ভেবেছিলেন, ব্যাট করতে নামার আগে সোয়েটারটা খুলে ফেলবেন। কিন্তু এখন তাঁকে মত বদলাতে হল। সোয়েটার পরেই মাঠে নামতে হবে। তা না হলে বড্ড শীত করবে।

ততোক্ষণে ওভাল মাঠ কানায় কানায় ভরে গেছে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করার জন্যে আম্পায়াররা মাঠে নেমে পড়েছেন। পিচের দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছেন তাঁরা। ব্র্যাডম্যান তাঁর দল নিয়ে মাঠে নামতে যাচ্ছেন—অমনি জোরে বৃষ্টি নামলো। প্রায় মাঝ মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আম্পায়াররা প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন। বেশ ভিজে গেছেন ওঁরা।

একটু পরেই মেঘটা কেটে গেল। সোনালী রোদ ঝলমলিয়ে উঠলো আবার। পাক্কা পঁয়ত্রিশটি মিনিট নষ্ট।

ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে। ফ্লিটউড স্মিথ প্যাভেলিয়নের দিক থেকে বল করতে এলেন কারণ সেই মুহূর্তে ব্র্যাডম্যান কোন রকম ঝুঁকি নিতে চান না। কিন্তু ম্যাককেব আর

ওয়েটকে তখন বল করতে পাঠালেই বোধহয় ভালো হতো। স্মিথের বল লেল্যাণ্ড পিছিয়ে এসে কাট করলেন। দু রান। পরের বলে আরো এক। অন্য দিক থেকে যথারীতি ও'রিলিই বল করতে শুরু করলেন। তাঁর বলে লেল্যাণ্ড দুটি রান নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেল বেস-রোডসের রেকর্ড। (১৯১২ সালে মেলবোর্ণে হবস আর রোডস ৩২৩ রান করেছিলেন দ্বিতীয় উইকেটে। এইটিই ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন উইকেটের রেকর্ড সংখ্যক রাণ।)

স্মিথের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল হাটন মিড অফের ওপর দিয়ে মেরে চার রান পেলেন।

ততোক্ষণে মাঠ প্রায় শুকিয়ে গেছে। কিন্তু পিচ একটু ভিজে ভিজে। হাটন খুবই সতর্ক। কারণ বল আচমকাই লাফিয়ে উঠছে। একটা বল তো উইকেটরক্ষকের মাথার ওপর দিয়েই চলে গেল। ফিঙ্গলটন ও ব্রাউন সর্টলেগে হাটনের প্রায় মুখের ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁরা চাইছেন হাটনকে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে। ১৬০ রান করলে কি হবে হাটনের সেই মুহূর্তে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো।

একটু পরে উইকেটও শুকিয়ে গেল। সেই সঙ্গে কেটে গেল হাটনের অস্বস্তির ভাব। হাটন ও লেল্যাণ্ড আবার মার মেরে খেলার জন্যে প্রস্তুত হলেন। লেল্যাণ্ড প্রচণ্ড জোরে ড্রাইভ করতে লাগলেন। মিড অফ, কভার ও এক্সট্রা কভারে দুজনকে রেখেও ব্র্যাডম্যান রানের গতি রুখতে পারলেন না।

হাটনের আচরণে মারকুটে ভাব বিশেষ ছিল না। কাট ও লেট কাট থেকে রান সংগ্রহ করে তিনি সন্তুষ্ট। ফলে লেল্যাণ্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন। ব্র্যাডম্যানও ও'রিলির বদলে ওয়েটকে বল করতে ডাকলেন। স্মিথও দারুণ বল করছিলেন। একটা 'চায়না-ম্যান' বল পেয়ে লেল্যাণ্ড হাঁকাতে গেলেন। পারলেন না। বলটা সামান্যর জন্যে তাঁর অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে গেল। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা দারুণ ফিল্ডিং করছিলেন। তবু কম করেও মিনিটে একটা

রান উঠছিলোই। ফলে একটা বাজার আগেই দলের রান ৪০০র গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল।

কভারে যাঁরা ফিল্ডিং করছিলেন বল ধরে ধরে তাঁদের হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্র্যাডম্যান কিছুতেই তাঁদের সরাবেন না। পিছিয়ে বাউণ্ডারী লাইনের কাছাকাছি পাঠাবেন না। তাঁর ধারণা ব্যাটসম্যান ভুল করবেনই। আর যখনই হোক উইকেটের কাছাকাছি দাঁড়ানো খেলোয়াড় ক্যাচ লোফার সুযোগ পেয়ে যাবেন।

ও'রিলি আবার বল করতে এসেছেন। হাটন তাঁর বল কভারে জোরে মারলেন। একটি সহজ রান। কিন্তু কভারে লিণ্ডসে হ্যাসেট বলটি ঠিকভাবে ধরতে পারলেন না। লেল্যাণ্ড রানটা নিতে নিতে দেখলেন বলটা হ্যাসেটের হাতে লেগে কয়েক গজ গড়িয়ে গেল। অর্থাৎ আরো একটি রান নেওয়া যায়। ফলে দ্বিতীয় রানটির জন্যে তিনি ছুটতে শুরু করলেন। হাটনও সাড়া দিয়েছেন। বারনেট হ্যাসেটের কাছ থেকে বলটা পাবার জন্যে প্রস্তুত। সেই মুহূর্তে কেউই কোন বিপদের গন্ধ পাননি। না অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা, না হাটন কিম্বা লেল্যাণ্ড। ও'রিলিও বোলার প্রান্তে উইকেটের কাছে এসে দাঁড়াননি নিরর্থক ভেবে।

কিন্তু হ্যাসেট দেখলেন তাঁর ত্রুটির জন্যেই দুটো রান হয়ে যাচ্ছে। এবং লেল্যাণ্ড হেলতে দুলতে দ্বিতীয় রানটি নিচ্ছেন। তাঁর মনে হল এই সুযোগ! মুহূর্তের মধ্যে তিনি বলটা তুলে নিলেন হাতে। ব্র্যাডম্যান ছিলেন ডিপ মিড অনে। হ্যাসেটের মনোভাব তিনি চট করে বুঝে নিয়ে ছুটে এলেন বোলারের দিককার উইকেটের দিকে। হ্যাসেটকে বলটা ছুড়তে দেখলেন লেল্যাণ্ড। বুঝলেন—বিপদ। কিন্তু বড্ড দেরীতে। পড়ি মরি করে তিনি ছুটলেন ঠিকই। কিন্তু তার আগেই হ্যাসেটের ছোঁড়া বল এসে গেছে ব্র্যাডম্যানের হাতে। বলটা লুফেই ব্র্যাডম্যান উড়িয়ে দিলেন বেল। লেল্যাণ্ড তখনও ক্রীজের বাইরে।

হ্যাসেটের তৎপরতা আর ব্র্যাডম্যানের বোধশক্তি হাটন-লেল্যাণ্ডের

জুটি ভেঙে দিল। ইংলণ্ডের এক উইকেটে ২৯ থেকে শুরু করে তাঁরা দলের রানকে টেনে এনেছেন ৪১১তে। অর্থাৎ দুজনে মিলে জুড়েছেন ৩৮২ রান। এর মধ্যে লেল্যাণ্ডের সংগ্রহ ১৮৯।

কিন্তু হ্যাসেটের ব্যাপারটা কি? তিনি কি ইচ্ছে করেই ভুল করে লেল্যাণ্ডকে বোকা বানিয়েছেন? কিন্তু হ্যাসেট স্কুলের ছাত্রদের মতো কৌশল অবলম্বন করবেন এ কথা ভাবাই যায় না। তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিটি খেলোয়াড়ের বিশ্বাস—হ্যাসেটের ঐ যে বলটা ঠিক ভাবে ধরতে না পারা—ওটা ইচ্ছাকৃতই।

তখন বেলা একটা দশ। ইংলণ্ড দ্বিতীয় উইকেট হারালো। শুরুটা সত্যিই দারুণ। কিন্তু আরো রান চাই, আরো রান। কারণ হ্যামণ্ডের ধারণা, ছ'শর কম রান করলে তাঁদের হেরে যেতে হতে পারে!

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির তখনো কুড়ি মিনিট বাকী। সাত ঘণ্টার ওপর প্যাড পরে যে মানুষটি বসেছিলেন—ইংলণ্ডের অধিনায়ক সেই ওয়ালটার হ্যামণ্ড ব্যাট করতে নামলেন। ব্র্যাডম্যান স্পিন বোলারদের দিয়েই আক্রমণ চালাতে লাগলেন। কারণ ১৯৩২ সালে মেলবোর্নে হ্যামণ্ডের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে স্মিথকে কয়েক বছরের জন্যে টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ইংলণ্ডের রান দু উইকেটে ৪৩৪—হাটন ১৯১ ও হ্যামণ্ড ২০ রানে অপরাজিত।

বিরতির পরই ব্রাডম্যান নতুন বল নিলেন। ওয়েট আর ম্যাককেব দারুণ বল করতে লাগলেন। ওয়েটের বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে হাটন দু দুবার ফস্কালেন। ভাগ্য ভালো যে বল ব্যাটে লাগেনি। হাটন ও হ্যামণ্ড বিরতির পরের এক ঘণ্টায় ৪৩য়ের বেশী রান করতে পারলেন না। পরে স্পিন বোলাররা এলেও কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হলো না। হ্যামণ্ড তখন বড় বেশী সংযত। তবে মাঝে মাঝে বাউণ্ডারী হাঁকিয়ে হাটন দর্শকদের হাততালি কুড়োতে লাগলেন।

হাটনের দু'শ রান পূর্ণ হতে বেশী সময় লাগলো না। সেই সঙ্গে উঠে গেল দলেরও পাঁচশ রান। স্মিথের হাতে আবার বল তুলে দিলেন ব্র্যাডম্যান। স্মিথের বল তখন অনেকটা করে ঘুরছিল। তাই

দেখে ব্র্যাডম্যান স্লিপে একজনকে দাঁড় করালেন। স্মিথের একটি বল কভারে ড্রাইভ করে হ্যামণ্ড চার রান পেলেন। এবং তাঁর ব্যক্তিগত অর্ধশত রাণ পূর্ণ হল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হ্যামণ্ডের এইটিই শেষ পঞ্চাশ রান।

কয়েক ওভার পরে স্মিথের একটা বল হঠাৎ দারুণ ভাবে লেগের দিক থেকে ঘুরে এল। বলটা যে অতোটা ঘুরবে হ্যামণ্ড তা ভাবতেই পারেননি। তিনি বলটা লেগের দিকে ঘুরিয়ে মারতে গেলেন। ফস্কালেন এবং এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে গেলেন। হ্যামণ্ডের রান তখন ৫৯। এবং ইংলণ্ডের তিন উইকেটে ৫৪৬। হ্যামণ্ড ও হাটন ১৩৫ রান যোগ করলেন। এই সময় হাটন হ্যামণ্ডের ২৪০ রানের রেকর্ড ডিঙিয়ে গেলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হ্যামণ্ড মাস দুয়েক আগে লর্ডস মাঠে ঐ নজীর গড়েছিলেন।

হ্যামণ্ড ভাবতেই পারেননি যে বলটা অতোটা ঘুরবে আর তিনিও ঐ ভাবে আউট হয়ে যাবেন। ক্ষুব্ধ হ্যামণ্ডের ভ্রূ মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে গেলো। তারপরই তিনি ফিরে চললেন প্যাভেলিয়নের পথে।

পেণ্টার যখন মাঠে নামলেন আকাশে তখন আবার মেঘের ঘনঘটা। যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। বাজের শব্দে কেঁপে উঠতে পারেন ওভাল মাঠের দর্শকরা। এক ঝলক বিদ্যুৎ আকাশ চিরে চমকে দিয়ে গেল সকলকে। নতুন ব্যাটসম্যানের কাছে সময়টা বিশ্রী। ও'রিলিও পরের ওভারের জন্যে প্রস্তুত।

হাটন প্রথম বলেই একটা রান নিলেন। ও'রিলি তখন দারুণ বল করছেন। পেণ্টার হাড়ে হাড়ে তা টের পেলেন। সত্যি ঐ রকম আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের বিরুদ্ধে হাটন কি করে ২৫০ রান করলেন!

ও'রিলির পরের বলটা গুগলি ভেবে খেলতে গিয়ে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন পেণ্টার। এবং এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে গেলেন। অথচ এই বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই প্রথম টেস্টে তিনি ২১৬ রান করেও হার মানেননি।

মাঠে আলো-আঁধারি পরিবেশ। কিন্তু আম্পায়াররা নির্বিকার।

তাঁদের খেলা চলার মত আলো ঠিকই আছে। কম্পটন ব্যাট করতে এলেন। হ্যামণ্ড তাঁকে পই পই করে বলে দিয়েছেন—যে করে হোক উইকেটে টিকে থাকতেই হবে। চা পানের বিরতির আগে কিছুতেই আউট হওয়া চলবে না। আর কম্পটন বলেই বোধহয় তা সম্ভব হল।

চা পানের বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু চললো না বেশীক্ষণ। একটু পরেই থেমে গেল।

তখন বেলা পাঁচটা। মেঘলা আকাশ। অন্ধকার অন্ধকার ভাব। কিন্তু আম্পায়াররা মাঠে নেমে পড়লেন। ব্র্যাডম্যান বল তুলে দিলেন ওয়েটের হাতে। মাঠের ঐ অবস্থায় ফাস্ট বোলারদের সত্যিই খেলা যায় না। বলই তো দেখা যায় না। বোলারের হাত ঘুরানো দেখে কম্পটন বলের লাইনে খেলতে গেলেন আন্দাজে। গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর ব্যাট চলে গেলো বলের উপর দিয়ে। ফলে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো পাঁচ উইকেটে ৫৫৫। মাত্র ৯ রানের মধ্যে ইংলণ্ড তিন তিনটে উইকেট হারালো। কি অদ্ভুত পরিবর্তন। দু উইকেটে ৫৪৫ থেকে পাঁচ উইকেটে ৫৫৫। স্বীকৃত ব্যাটসম্যান বলতে আর মাত্র একজনই আছেন। সেই হার্ডস্টাফ মাঠে নামলেন।

হাটন তখন ক্লান্ত। অবসন্ন। আর পারছেন না ঐ প্রচণ্ড ধকল সামলাতে। ইংলণ্ড বুঝি একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অনেক-অনেক রান করার যে সুযোগ তারা পেয়েছিল এই মুহূর্তে তাকে আকাশ-কুসম বলে মনে হচ্ছে। এখন ছ'শ করতে পারলে হয়! হাটনের মনের কোণে যে আশা বিন্দু বিন্দু করে জমে উঠেছিল—তা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। হতাশায় ভেঙে পড়তে চাইছে তাঁর মন। সেই ১৬ বছর বয়স থেকে যে স্বপ্ন তিনি দেখে আসছেন—সেই স্বপ্ন, সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হবার মুখে এসেও বুঝি হারিয়ে যাবে। হাটন পারবেন না তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে? পারবেন না ব্র্যাডম্যানের সব চেয়ে বেশী রানের রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে!

কিন্তু হার্ডস্টাফ একটু অন্য ধরনের মানুষ। পরিস্থিতির মোকা-

বিলায় তিনি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাঠে আলো-আঁধারি পরিবেশে তাঁর চোখ বুঝি জ্বলছে। ওভালের আকাশে কালো মেঘ আরো বেশী করে জমাট বেঁধেছে। হার্ডস্টাফ কিন্তু ঐ পরিবেশের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিলেন। স্মিথের বলে মেরে খেলতে লাগলেন। ও'রিলিকে ঠিকমতো মারতে না পারলেও পিছিয়ে এসে ও'রিলির একটা বল ড্রাইভ করে এক্সট্রা কভার দিয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন।

ক্লান্ত হাটন তখন দেখে শুনে খেলছেন। কিন্তু যেন আর পেরে উঠছেন না। তাঁর রান তখন ২৮০। হঠাৎই ভুল করে বসলেন। ও'রিলির একটা বল হাটনের ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপের দিকে উড়ে গেলো। এই রকমই যে একটা কিছু ঘটতে পারে ব্র্যাডম্যান তা আগেই আঁচ করে-ছিলেন। তাই স্লিপে একজনকে এনে রেখেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য ভালো বলটা সেই স্লিপের ফিল্ডারের বেশ কিছুটা সামনে মাটিতে পড়লো।

এই ভুল হাটনের মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলো। ভুলটা বড়ই বোকার মতো করেছেন তিনি। মাথাটা নাড়তে লাগলেন হতাশার ভঙ্গীতে। তাঁর মনের ভারটা কাটিয়ে দিতে হঠাৎই সমস্ত মাঠটা উল্লাসে ফেটে পড়লো।

চমকে উঠলেন হাটন! ব্যাপারটা কি? সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাও। চোখ পড়লো স্কোর বোর্ডের দিকে। তাঁর নামের পাশে রান ২৮৮। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। অর্থাৎ হাটন ডিঙিয়ে গেলেন ৩৪ বছর আগে গড়া আর. ই. ফস্টারের ২৮৭ রানের নজীর। সিডনিতে ফস্টার ঐ রেকর্ড গড়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে হাটন তাঁর তৃতীয় শত রান বা ৩০০ রান পূর্ণ করলেন। তাঁর সঙ্গী হার্ডস্টাফের রান তখন ৪০। এবং ইংলণ্ডের পাঁচ উইকেটে ৬৩৪।

আধ ঘণ্টা আগে নতুন বল নিতে পারতেন ব্র্যাডম্যান। কিন্তু নেন-নি। তৃতীয় দিন সকালের জন্যে রেখে দিয়েছেন। ব্র্যাডম্যান যেন বুঝতে পেরেছেন হাটন তাঁর সর্বোচ্চ রানের নজীর ডিঙিয়ে যাবার

লক্ষ্যেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। না, তা কিছুতেই হতে দিতে পারেন না ব্র্যাডম্যান। হাটনকে রুখতেই হবে।

আরো পঁয়ত্রিশ রান। ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ডিঙিয়ে যেতে হলে হাটনকে আরো পঁয়ত্রিশ রান করতে হবে।

পারবেন কি হাটন ঐ রান করতে? পারবেন কি তিনি ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙতে? খেলার দ্বিতীয় দিনের শেষে দর্শকরা মাঠ ছাড়লেন এই চিন্তা, এই প্রত্যাশা মনে নিয়ে।

কিন্তু প্যাভেলিয়নে তখন ভিড়ে ভিড়। সকলেই এসেছেন হাটনকে শুভেচ্ছা জানাতে। উৎসাহ জানাতে। সাংবাদিকরা চাইছেন একান্তে কথা বলতে। কিন্তু যে মানুষটিকে তখন সকলে কাছে চাইছেন তাঁর শরীর তখন ভেঙে পড়তে চাইছে। সারাদিনের মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন তিনি। শরীর চাইছে একটু বিশ্রাম, মন চায় নিজেকে একা পেতে।

কিন্তু নিস্তার পেলেন না তিনি। পাক্কা দু ঘণ্টা ধরে চললো ঐ ঝামেলা। গ্রেট সেণ্ট্রাল হোটেলে হাটন যখন ঢুকলেন তখন আর তাঁর চলার ক্ষমতা নেই। কোন রকমে শরীরটা টেনে নিয়ে গিয়ে ফেললেন লাউঞ্জে একটা চেয়ারের ওপর।

ভেরিটি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁকে। রোদে ঝলসানো হাটনের চেহারার মধ্যেই ফুটে উঠেছিল অবসাদের প্রচণ্ড ছাপ। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন ভেরিটি। বললেন,

"ওহে ছোকরা, তোমার এখন একটু কিছু খাওয়ার দরকার। এনে দিই, কি বলো?"

"তাই দিন।"

"দাঁড়াও, আমি তোমায় একটা জিনিস এনে দিচ্ছি যা খেলে তুমি এক্ষুণি খাড়া হয়ে উঠবে।"

কয়েক চুমুকে পুরো গ্লাসটাকেই শেষ করে দিলেন হাটন। খেতে এমন কিছু ভালো লাগলো না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন, আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। অবসাদের সেই বিশ্রী ভাবটা কেটে

যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ভেরিটিও তাকিয়ে ছিলেন হাটনের দিকে। স্পষ্ট দেখলেন, হাটনের চোখের সেই দীপ্তি আবার ফিরে আসছে। সেই মিইয়ে পড়া ভাবটা দিব্যি কেটে যাচ্ছে।

সন্ধ্যেটা ভালোই কাটলো। বিশ্রাম করেই সময় কেটে গেলো। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম এলো না চোখে। সারাক্ষণই তিনি শুধু খেলছেন আর খেলছেন। খেলছেন ও'রিলির বল। শুধু ও'রিলিকেই খেলছেন। তিনি জানতেন ফ্লিটউড স্মিথ তাঁকে সহজেই আউট করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন-জাগরণে আর কেউ নয়—তিনি শুধু ও'রিলিকেই খেললেন। আর সেই দুঃস্বপ্নে তিনি সহজ ফুলটস বলগুলো ফস্কালেন, উইকেটের কাছাকাছি দাঁড়ানো লেগের দিককার ফিল্ডারের হাতে তুলে দিলেন তোল্লা ক্যাচ, ইয়র্কার বলের ওপর দিয়ে ব্যাট চালালেন।

এবং ভয়ে ভয়ে ভাবলেন এই রকমই একটা কিছু হয়তো কাল সকালে ঘটবে।

কোন রকমে রাতটা কেটে গেল।

সকালে ব্রেকফাস্টের জন্যে নিচে নামতে গিয়েই দেখলেন যে ঠিক মত হাঁটতে পারছেন না। পা নাড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। হাঁটতে গেলেই খুঁড়োচ্ছেন। শক্ত হয়ে আছে পায়ের মাংসপেশী। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলেন হাটন। কিন্তু শক্ত ভাবটা কমলো না। সাড়ে এগারোটার সময় হাটন যখন তাঁর অসমাপ্ত ইনিংস শুরু করার জন্যে মাঠে নামলেন তখনো তাঁর পায়ের মাংসপেশী ইটের মত শক্ত।

"গুড লাক, লেন।"

হার্ডস্টাফ হাটনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দুজনেই তখন পিচের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

"থ্যাঙ্কস জো···।"

তিরিশ হাজার দর্শকের হাততালিতে মাঠটা গমগম করছে। সকলেই উৎসাহ জানাচ্ছেন হাটনকে। হঠাৎ তাঁর বাড়ির কথা মনে

পড়লো। বাবা এতোক্ষণ কাজে বেরিয়ে গেছেন। মা নির্ঘাত বসে আছেন রেডিওর ধারে। লেন ভালোভাবেই জানেন যে তাঁদের পুরো শহরটাই এখন রেডিওর আশেপাশে। মাঠের এই তিরিশ হাজারের মতো তাঁরা সকলেই চান হাটন ভেঙে দিন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড। সেই নজীর ডিঙোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাটে বলের যে তুমুল লড়াই হবে তার জন্যে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। সকলেরই মনে আশা-নিরাশার দোলা। লেনও বেশ ভালোভাবেই জানতেন যে তিনশ রান তিনি করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত এবং কষ্টকর হবে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙার জন্যে প্রয়োজন আরও ৩৫ রান করা।

ব্র্যাডম্যান বল তুলে দিলেন ও'রিলির হাতে। ব্যাটসম্যান হার্ডস্টাফ। মেডেন ওভার। অপর প্রান্ত থেকে এলেন ক্লিটউড স্মিথ। ন্যাটা স্মিথ 'ওভার দি উইকেট' বল করছেন লেগ স্টাম্প তাক করে। তখন লেগ স্লিপে একজন। একজন ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে। স্লিপে কেউ নেই।

স্মিথের একটা বল লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে হাটন একটা রান নিলেন। শতরানের মুখে এসে ব্যাটসম্যানরা সাধারণত এইভাবে রান নেন। তবু দর্শকরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। ওঁরা বোধহয় ঠিকই করে এসেছিলেন যে হাটন রান নিলেই হাততালি আর চিৎকার করে তাঁকে উৎসাহ জানাবেন। হার্ডস্টাফ পরের বলে দুই ও তারপর এক রান নিলেন। ও'রিলি আরো একটা মেডেন ওভার পেলেন। কিন্তু স্মিথ হাটনকে রীতিমত বিব্রত করে তুললেন। দু'দুবার বল তাঁর প্যাডে লাগলো। হার্ডস্টাফ মাঝে মাঝে দারুণ মার মারছিলেন। ও'রিলির একটা বল লেট কাট করে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে হার্ডস্টাফ তাঁর ব্যক্তিগত অর্ধশত রান পূর্ণ করলেন। হাটন দারুণ সতর্ক হয়ে খেলছেন। লেগের দিকে বল ঠেলে ঠেলে এতোক্ষণে তিনি মাত্র পাঁচটি রান সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ তাঁর স্বপ্ন সার্থক করতে এখনো তিরিশ রান দরকার।

ব্র্যাডম্যান এবারে লেগের দিকে ফাঁদ পাতলেন। নিজে গেলেন

ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিং করতে। হাটনকে তাই অফের দিকের বলের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হল। একটু পরেই স্মিথ একটা 'ওভার পিচ' বল দিলেন এবং হাটনের ড্রাইভ সেটি পত্রপাঠ বাউণ্ডারিতে পাঠালো।

এর পর থেকে স্মিথ তাঁর নিশানা লেগ স্টাম্পের ওপরই রাখলেন এবং হাটনকে ঝুঁকে পড়ে সেই স্পিন বলে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল বার বার। উইকেটে পড়ে বল তখন অল্প অল্প লাফাচ্ছে। একটা অফ ব্রেক আচমকা লাফিয়ে উঠলো। ভাগ্য ভালো তাই হাটন

ব্যাটে—বলে ক্ষুরধার লড়াই তখন তুঙ্গে চড়েছে। হাটনের লক্ষ্য আরও এগিয়ে যাওয়া। অস্ট্রেলীয় নিরুচ্চার আক্রমণের সংকল্প, হাটনকে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে ধরা। নাটকীয় উত্তেজনা তখন প্রায় পঞ্চমাঙ্কে। সারা মাঠ স্তব্ধ। গ্যালারিতে ছুঁচ পড়লে বুঝি শব্দের ধাক্কায় হৃদপিণ্ড ধপধপিয়ে ওঠে।

বেঁচে গেলেন। কিন্তু তাই দেখে ব্র্যাডম্যান এবং উইকেটের কাছাকাছি দাঁড়ানো অন্য ফিল্ডাররা আরো খানিকটা এগিয়ে এলেন। স্মিথের পরের বলটা লংহপ। হাটন পিছিয়ে এসে সজোরে ব্যাট ঘোরালেন। বলটা তাঁর ব্যাটের ঠিক মধ্যিখানেই লাগলো। মাথা নীচু করে ফিল্ডাররা আঘাত এড়ালেন এবং বলটা বাউণ্ডারীর দিকে ছুটে গেল।

ও'রিলির বল তেমন ঘুরছিল না। কিন্তু একটা বল হঠাৎ অনেকখানি ঘুরে উইকেটের দিকে ধেয়ে এল। আর হাটনের ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপের দিকে উড়ে গেল। সহজ ক্যাচ। কিন্তু স্লিপে কাউকে রাখেন নি ব্র্যাডম্যান। হতাশায় মাথা চাপড়ালেন ও'রিলি। হাটনের তখন ৩১৫ আর ইংলণ্ডের ৬৭০ রান। স্মিথের একটা লেগ ব্রেক হাটন ফস্কালেন। কিন্তু বলটা অফ স্টাম্পের ধার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

ব্র্যাডম্যান বুঝলেন স্পিনারদের দিয়ে কিছু হবে না। তাই নতুন

বল চেয়ে নিলেন আম্পায়ারের কাছ থেকে। সেই ইনিংসের চতুর্থ নতুন বল। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা তখন দারুণ ফিল্ডিং করছেন। তাঁরা বিনা সংগ্রামে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড কিছুতেই ভাঙতে দেবেন না।

হঠাৎই কালো মেঘে ছেয়ে গেলো আকাশ। সকালের সোনালী রোদ আর নেই। মেঘলা পরিবেশ। হাটন অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকালেন। হায় ভগবান! ওয়েট আর ম্যাককেব যে নতুন বলে এবার দারুণ সুইং করাতে পারবেন!

হাটন তখন তাঁর সেই অবিস্মরণীয় নজীর গড়ার প্রায় দোরগোড়ায় এসে পৌঁচেছেন। স্নায়ুযুদ্ধের সেই প্রচণ্ড মুহূর্তে ও'রিলিকে ব্র্যাডম্যান সরিয়ে নেওয়ায় তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন। এবং রান ওঠার গতিও চট করে বেড়ে গেল। বিশেষ করে হার্ডস্টাফ। তিনি সেই মুহূর্তে মার-মার মূর্তি ধরলেন। হাটন ওয়েটের বল লেগ গ্লান্স করে দুই ও তারপরই একটি দর্শনীয় লেট কাট তাঁকে চার রান এনে দিল। দর্শকরা কিন্তু চুপ। তাঁরা ভয়ে ভয়ে আছেন। ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে হাটনের এই অতি উৎসাহ ভরে খেলা তাঁরা মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁদের ভয় হয়তো মারতে গিয়ে হাটন আউট হয়ে যাবেন, হয়তো ব্র্যাডম্যান আবার ও'রিলিকে আক্রমণ শানাতে ফিরিয়ে আনবেন।

হলোও ঠিক তাই। তিন ওভার পরেই ব্র্যাডম্যান আবার ও'রিলির হাতেই বল তুলে দিলেন। ও'রিলি এবার প্যাভেলিয়নের দিক থেকে বল করবেন। ব্র্যাডম্যান গিয়ে দাঁড়ালেন সিলি মিডঅফে। ব্রাউনকে আনলেন সিলি মিডঅনে। ফিল্ডিং এমন ভাবে সাজালেন যাতে হাটন কখনোসখনো এক-আধটা রান নিতে পারেন। কিন্তু চার কিছুতেই না।

হার্ডস্টাফ তখন দারুণ খেলছিলেন। নিজে যেমন রান করছিলেন, তেমন বার বার হাটনকে তাঁর বিশ্বরেকর্ড গড়ার পথে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিচ্ছিলেন। আসলে হাটনের মানসিক উত্তেজনা আর স্নায়ুর

চাপ কমাবার জন্যেই হার্ডস্টাফ ঐ ভাবে মার মেরে খেলতে শুরু করেছিলেন। সেদিনের প্রথম ঘণ্টায় তু'জনে মিলে ৬০ রান যোগ করলেন। হার্ডস্টাফ ৩৭ আর হাটন ২১। এবং ইংলণ্ডের পাঁচ উইকেটে ৬৯৪।

হাটন সেই মুহূর্তে ভুলে যেতে চাইছিলেন যে গত তু'দিন ধরে খেলে তিনি ব্র্যাডম্যানের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেবার পথে এগিয়ে চলেছেন। এই যেন তিনি সবে খেলতে শুরু করেছেন। এসেছেন ইংলণ্ডের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে। তাই নজর তাঁর আত্মরক্ষার দিকেই বেশী। মাঝে মাঝে এক-একটা রান নিচ্ছেন। পেছন ফিরে দেখলেন ও'রিলি বল করতে আসছেন। হার্ডস্টাফ বলটাকে চুপ করে থার্ডম্যানের দিকে পাঠালেন। একটি রান। ও'রিলির পরের বলটা হাটনের পায়ের কাছে পড়ল। তিনি সহজেই সেটিকে কভারের দিকে ঠেলে একটা রান নিলেন। হাটনের রান ৩২২।

ওভার শেষ। ওয়েট বল করবেন। প্রথম বল অফ স্টাম্পের একটু বাইরে। হাটন ডান পা সরিয়ে আনলেন পেছনের দিকে। মাথা হেলে পড়ল স্টাম্পের ওপর, তারপর বলটা কাট করলেন। লেট কাট। বলটা দ্রুত ছুটে গিয়ে ঘা খেল প্যাভেলিয়নের রেলিংয়ে। ৩২৬ রান। কিন্তু দর্শকরা চুপ। তাঁরা শঙ্কিত। উত্তেজনায় তাঁদের বুক কাঁপছে। মস্ত এক সম্ভাবনার প্রত্যাশা তাঁদের সেই মুহূর্তে মূক করে দিয়েছে। তাই হাটনের ঐ দর্শনীয় লেট কাট কিম্বা বাউণ্ডারীতে হাততালি পড়লো না। কেউ খেয়ালই করলেন না যে হাটনের ঐ বাউণ্ডারী ইংলণ্ডের রানকে সাতশ'র ঘরে পৌঁছে দিয়েছে!

ঐ ওভারেই ওয়েটের আর একটা বল থার্ডম্যানের দিকে ঠেলে একটা ও ও'রিলির ওভারের একটা বল লেগের দিকে ঘুরিয়ে হাটন আরো একটা রান নিলেন। তাঁর রান তখন ৩২৮।

অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে ফ্লিটউড স্মিথের বল খেলতে ব্যাটস-ম্যানদের বড্ড ঝামেলায় পড়তে হয়। যে কোন সময় যে কোন ব্যাটসম্যানকেই তাঁর বলে আউট হয়ে যেতে হবে। ব্র্যাডম্যান

এতোক্ষণ তাঁকে হাতে রেখেছিলেন। ঠিক করে রেখেছিলেন, হাটন যখন তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার কাছাকাছি পেঁছুবেন তখনই তাঁর ওপর স্নায়ুর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে স্মিথকে বল করতে পাঠাবেন। এখন এসেছে সেই সময়। ব্র্যাডম্যান বল তুলে দিলেন স্মিথের হাতে। উইকেটের চারপাশে আটজন খেলোয়াড় এনে ঘিরে ফেললেন হাটনকে। একমাত্র হ্যাসেট একটু দূরে কভার অঞ্চলে দাঁড়ালেন।

হাটনের ক্যাপ তাঁর ডান কান পর্যন্ত নেমে এসেছে। গত দু'দিনে তাঁর ওজন অনেক (আধ স্টোন) কমে গেছ। তাঁকে ঘিরে ধরা অস্ট্রেলিয়ার শক্ত-সমর্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে হাটনকে ছোট্টখাট্টো, রোগা-রোগা লাগছে।

ফ্লিটউড স্মিথকে হাটন একবারও ভক্সহল প্রান্ত থেকে খেলেননি। এও ব্র্যাডম্যানের একটা চাল। স্মিথের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলটা হাটন প্রথমটায় দেখতেই পাননি। দেখতে পাবার পর বলটার ওপর সতর্ক নজর রেখে তিনি পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু বলটা লেগের দিক থেকে আচমকা ঘুরে এল একটু উঁচু হয়ে। হাটন ঠিক উইকেটের সামনে এবং বলটা এসে লাগলো তাঁর প্যাডে। উত্তেজনায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠলেন।

হা-উ-স দ্যাট···

আম্পায়ার চেস্টার একটুও নড়লেন না। ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ে উঠলো। কিন্তু ব্র্যাডম্যান সহ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা স্পষ্ট শুনতে পেলেন, 'নট আউট'।

বলটা লাফিয়ে উঠেছিল। হাটনের প্যাডে না লাগলেও সেটি উইকেটের ওপর দিয়েই চলে যেত।

ক্রিকেট মাঠ যে এতো চুপচাপ হতে পারে, কেউ তা বোধহয় ভাবতেও পারেন না। একটা ছুঁচ পড়লে তার শব্দও বোধহয় শোনা যাবে। তিরিশ হাজার দর্শকের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনিও যেন মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল। আম্পায়ার চেস্টার আবার তাকে চালু করলেন।

ফ্লিটউড স্মিথ দারুণ বল করছেন। তাঁর চেয়ে ভয়ঙ্কর বোলার সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউ নেই। না, ও'রিলিও না। স্মিথের পরের দুটো বল হাটন কোন রকমে খেললেন। কিন্তু চতুর্থ বলটা সাঙ্ঘাতিকভাবে ঘুরে এলো লেগের দিক থেকে। এবং লাগলো প্যাডে। হাটন ভালভাবেই জানতেন তিনি উইকেট আড়াল করে আছেন কিন্তু বলটা প্যাডে লাগার আগে পিছলে এসে হাটনের ব্যাটে আঁচড় কেটে গেল। সামান্য একটু শব্দ। আম্পায়ারের শোনার কথা নয়। শুনলেও কি করে যে কি হল তাও বোঝা অসম্ভবই।

ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা 'হাউজ দ্যাট' বলে চিৎকার করে উঠেছেন।

কিন্তু ফ্রাঙ্ক চেস্টার বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আম্পায়ার। সর্বকালেরও বটে। একবার তিনি একজন ব্যাটসম্যানকে আউট দেননি। আবেদন ছিল 'কট বিহাইণ্ডের' এবং প্রত্যেক খেলোয়াড় ব্যাটে বল লাগার শব্দ শুনেছিলেন। পরে যখন এই ব্যাপারে চেস্টারকে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বললেন, 'বলটা ব্যাটে লাগেনি। যে শব্দ শোনা গেছে তা বলটি স্টাম্পে লাগার।' চেস্টারের কথা কেউ বিশ্বাসই করলেন না। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে স্টাম্পের উপরের দিকে বলটি লাগার একটু লালচে দাগ রয়েছে।

কিন্তু আম্পায়ার চেস্টার সে ধাতের মানুষ নন। তাঁর মনসংযোগ করার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। হাটন যাই ভাবুক না কেন চেস্টার ঠিকই দুটি শব্দ শুনেছিলেন। তাই 'নট আউট' বলে হাঁক পাড়তে তাঁর মুহূর্তও দেরী হল না।

স্মিথের ওভার শেষ হতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন দর্শকরা। ব্রাডম্যান যে ও'রিলিকে বল করতে পাঠিয়েছেন সেদিকে কেউ নজরই দিলেন না।

পরের তিন ওভারে হাটন একটা করে রান নিলেন। ও'রিলিই তখন বল করছেন। ওভার শেষ হতে আর দু' বল বাকী। হাটনের রান ৩৩১।

আর মাত্র চারটি রান দরকার। তাহ'লেই হাটন ভাঙতে পারবেন ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ড।

ও'রিলির পরের বল।

আম্পায়ার ওয়ালডেন 'নো' ডাকলেন।

হাটনও যেন সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলেন তাঁর স্বপ্নে দেখা মুহূর্তটিকে। চোখ বুঁজে ব্যাট চালালেন। দর্শকদের চিৎকারে গমগম করে উঠলো মাঠ। হাটন যেভাবে ব্যাট চালিয়েছেন লাগলে নির্ঘাত চার।

কিন্তু ও'রিলির মাপা লেংথের বল এড়িয়ে গেল হাটনের ব্যাট। একটুর জন্যে হাটন পারলেন না 'নো' বলের সুযোগ নিতে।

স্মিথের ওভারের পরের বলেই হার্ডস্টাফ একটা রান নিলেন। হাটনকে তিনি বেশীক্ষণ ঐ প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রাখতে চান না। স্মিথকে অনেকক্ষণ খেলছেন হাটন। একটা লং হপে পড়া বলের জন্যে তিনি অপেক্ষা করে আছেন। পেলেই তিনি শর্ট লেগের মধ্যে দিয়ে বাউণ্ডারী হাঁকাতে পারবেন।

ন্যাটা স্মিথ বল করলেন। বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পরই হাটন বুঝলেন ওটি গুগলী। কিন্তু বলটা ছিল একটু খাটো লেংথে এবং সোজা। খেলতে না পারলেই অফ স্টাম্প ভেঙে দিয়ে যাবে। হাটন ঠিক করলেন, 'স্কোয়ার কাট' করবেন। স্কোয়ার লেগের দিকে সামান্য পিছিয়ে এলেন যাতে বলটা মারতে পারেন। একটুখানি হেলে পড়ে ব্যাট চালালেন হাটন। বলটা তাঁর ব্যাটের ঠিক জায়গাতেই লাগলো। তারপরই দেখলেন, বলটা দারুণ জোরে ছুটে যাচ্ছে বাউণ্ডারীর দিকে। কারো ক্ষমতা নেই সেটিকে ধরে। রান করার জন্যে ছোটারও দরকার নেই। চার—নির্ঘাত চার। এবং···

মনে হল হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। প্রচণ্ড চিৎকারে মাঠটা গমগম করে উঠলো। মাঠে কেউ কোথাও বসে নেই। সকলেই দাঁড়িয়ে উঠেছেন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছেন। কেউ হাততালি দিচ্ছেন, কেউ মাথার টুপি উড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে। সেই মুহূর্তে শুধু কাজ করে গেলেন স্কোরার।

হাটন সরাসরি তাকালেন স্কোর বোর্ডের দিকে। নিজের চোখে দেখলেন তাঁর স্বপ্নসফল মুহূর্তটি। সত্যিই তো? সত্যিই কি তিনি ভেঙেছেন ব্র্যাডম্যানের ৩৩৪ রানের বিশ্ব রেকর্ড? হ্যাঁ, তাই তো। তাঁর নামের পাশে লেখা ৩৩৫। তবু বিশ্বাস করতে মন চায় না।

ঠিক তখনই ব্র্যাডম্যান বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাত। অভিনন্দন জানালেন হাটনকে।

"ভগবানকে ধন্যবাদ, চরম পরীক্ষার মুহূর্ত শেষ।" আম্পায়ার ফ্যানি ওয়ালডেন নিজের মনে বললেন, "উঃ, শেষের কটা ওভার যেন দুঃস্বপ্নের মত ছিল।"

হাটনের এই ইনিংসটিই ছিল সেই খেলার সব কিছু। হাটন ও হার্ডস্টাফ দলের রানকে ৭৭০-এ টেনে নিয়ে গেলেন। এবং ষষ্ঠ উইকেটে গড়লেন নতুন রেকর্ড। হাটন শেষ পর্যন্ত ৩৬৪ রান করে আউট হলেন। ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট উইকেটে থেকে তিনি হাঁকিয়ে ছিলেন ৩৫টি চার। উড করলেন ৫০ রান। আর হার্ডস্টাফ ১৬৯ রানে অপরাজিত রয়ে গেলেন।

ইংলণ্ডের ৭৯৮রানের মাথায় ব্র্যাডম্যান বল করতে এলেন নিজেই। কিন্তু বল করার জন্যে ছুটে আসতেই তাঁর পা পড়লো অন্য বোলারদের বল করার সময় পা-পড়ে-পড়ে-হয়ে যাওয়া গর্তে। তাঁর গোড়ালি ঘুরে গেল। যন্ত্রণায় তিনি বসে পড়লেন মাটিতে। পরে দেখা গেল একটা হাড় ভেঙে গেছে। দলের খেলোয়াড়রা তাঁকে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন। ঐ খেলায় ব্র্যাডম্যান আর খেলতে পারবেন না। জ্যাক ফিঙ্গলণ্টনও আহত। তাঁর পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরে আছে।

সাত উইকেটে ৯০৩ রানের মাথায় হ্যামণ্ড ইংলণ্ডের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন।

ইংলণ্ড জিতলো এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় জয়ের নজীর।

স্কোর বোর্ড

ওভাল : ২০, ২২, ২৩ ও ২৪শে আগস্ট, ১৯৩৮

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে বিজয়ী

ইংলণ্ড

এল হাটন ক হ্যাসেট ব ও'রিলি	৩৬৪
ডব্‌লিউ জে এডরিচ এল বি ডব্‌লিউ ব ও'রিলি	১২
এম লেল্যাণ্ড রান আউট	১৮৭
ডব্‌লিউ হ্যামণ্ড এল বি ডবলিউ ব স্মিথ	৫৯
ই পেণ্টার এল বি ডবলিউ ব ও'রিলি	০
ডি কম্প্‌টন ব ওয়েট	১
জে হার্ডস্টাফ অপরাজিত	১৬৯
এ উড ক ও ব বার্ণেস	৫৩
এইচ ভেরিটি অপরাজিত	৮
অতিরিক্ত (বাই ২২, লে বা ১৯, ওয়াড ১, নো ৮)	৫০
	(৭ উইঃ ডি) ৯০৩

উইকেট পতন : ১/২৯, ২/৪১১, ৩/৫৪৬, ৪/৫৪৭, ৫/৫৫৫, ৬/৭৭০, ৭/৮৭৬

বোলিং :

ওয়েট	৭২-১৬-১৫০-১
ম্যাকবেব	৩৮-৮-৮৫-০
ও'রিলি	৮৫-২৬-১৭৮-৩
স্মিথ	৮৭-১১-২৯৮-১
বার্নস	৩৮-৩-৮৪-১
হ্যাসেট	১৩-২-৫২-০
ব্র্যাডম্যান	৩-২-৬-০

অস্ট্রেলিয়া

প্রথম ইনিংস

সি ব্যাডকক ক হার্ডস্টাফ ব বোওস	০
ডবলিউ ব্রাউন ক হ্যামণ্ড ব লেল্যাণ্ড	৬৯
এস ম্যাককেব ক এডরিচ ব ফার্নস	১৪
এ হ্যাসেট ক কম্পটন ব এডরিচ	৪২
এস বার্নস ব বোওস	৪১
বি বারনেট ক উড ব বোওস	২
এম ওয়েট ব বোওস	৮
ডবলিউ ও'রিলি ক উড ব বোওস	০
এল এফ স্মিথ অপরাজিত	১৬
ব্র্যাডম্যান আহত ব্যাট করেননি	
ফিঙ্গলটন আহত ব্যাট করেননি	
অতিরিক্ত (বা ৪, লে বা ২, নো ৩)	৯
	২০১

উইকেট পতন ঃ ১/০, ২/১৯, ৩/৭০, ৪/১৪৫, ৫/১৪৭, ৬/১৬০
৭/১৬০, ৮/২০১

বোলিং ঃ

ফার্নস	১৩-২-৫৪-১
বোওস	১৯-৩-৪৯-৫
এডরিচ	১০-২-৫৫-১
ভেরিটি	৫-১-১৫-০
লেল্যাণ্ড	৩.১-০-১১-১

দ্বিতীয় ইনিংস

ব্যাডকক ব বোওস	৯
ব্রাউন ক এডরিচ ব ফার্নস	১৫
ম্যাককেব ক উড ব ফার্নস	২
হ্যাসেট এল বি ডবলিউ বোওস	১০
বার্নস এল বি ডবলিউ ব ভেরিটি	৩৩
বারনেট ব ফার্নস	৪৬
ওয়েট ক এডরিচ ব ভেরিটি	০
ও'রিলি অপরাজিত	৭
স্মিথ ক লেল্যাণ্ড ব ফার্নস	০
(ব্রাডম্যান ও ফিঙ্গলটন ব্যাট করেননি)	
অতিরিক্ত	১
	১২৩

উইকেট পতন : ১/১৫, ২/১৮, ৩/৩৫, ৪/৪১, ৫/১১৫, ৬/১১৫, ৭/১১৭, ৮/১২৩

বোলিং :

ফার্নস	১২·১-১-৬৩-৪
বোওস	১০-৩-২৫-২
ভেরিটি	৭-৩-১৫-২
লেল্যাণ্ড	৫-০-১৯-০

Looking back on the 1934 tour in England. I think that, during it, I played the two best innings of my life···One was in our last match at Scarborrough, the other was at Lord's, against Middlesex.

—SIR DONALD BRADMAN

শনিবার। ১৯৩৪ সালের ২৬শে মে লর্ডসের আকাশে সেদিন সোনালী রোদ। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। দিব্যি নীল আকাশ। কিন্তু শীতও বড় কম নয়। বিলেতের মানুষের কাছে দারুণ আবহাওয়া। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা কিন্তু ঠাণ্ডায় কাঁপছেন। দু-দুটো সোয়েটার চাপিয়েও শীত-শীত করছে। বেলা এগারোটা নাগাদ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা যখন মাঠে এলেন তখন লর্ডস প্রায় ভরে গেছে। ব্যাডম্যানকে দেখার জন্যে ছুটোছুটি লেগে গেল ছোটদের মধ্যে। বড়রাও বাদ যাননি। ঐ ছোট্ট-খাট্টো মানুষটিকে সকলেই একবার কাছ থেকে দেখতে চান। জানতে চান, কি যাদু আছে তাঁর ব্যাটে। মানুষটিকে দেখলে কিন্তু অবাকই লাগে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না এই মানুষটি একটির পর একটি রেকর্ড গড়ে চলেছেন। এই মানুষটিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান।

কিন্তু সময়টা ব্র্যাডম্যানের ঠিক ভালো যাচ্ছে না। চার বছর আগের মত এবারও উস্টার্সে ডাবল সেঞ্চুরী করে ব্র্যাডম্যান ইংলণ্ড সফরের খেলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে তিনি নিজেকে যেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না। এ যেন এক অস্বাভাবিক অবস্থা, অসহনীয় পরিবেশ। ব্র্যাডম্যান রান পাচ্ছেন না। চটপট আউট হয়ে যাচ্ছেন। প্রথম খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী করার পরের পাঁচটা ইনিংসে করেছেন মাত্র ১০৭ রান। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ব্যাটিংয়ের গড়ে প্রথম থেকে ব্র্যাডম্যানের নাম নেমে এসেছে ষষ্ঠ স্থানে। ব্র্যাডম্যানের এই অসহায় অবস্থা সহ্য করতে পারছেন না

ইংলণ্ডের দর্শকরা। অথচ ব্র্যাডম্যান ভালো খেলতে না পারলে সবচেয়ে বেশী খুশী হবার কথা যে তাঁদেরই। ব্র্যাডম্যানের বয়স তখন মাত্র পঁচিশ। এই বয়সেই কি তিনি ফুরিয়ে যাচ্ছেন?

তাই সেদিন দর্শকরা অনেক আশা নিয়ে মাঠে এসেছেন। মিডল-সেক্সের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখতে তাঁরা লর্ডসে আসেননি, এসেছেন ব্র্যাডম্যানকে দেখতে। তাই মিডলসেক্স টসে জিতেছে শুনে দর্শকরা মোটেই খুশী হলেন না। তাঁরা ব্র্যাডম্যানের খেলা দেখতে চান। চান ব্র্যাডম্যানের সেই মারমুখী রূপ দেখতে। সেই ভয়ঙ্কর রূপ। যা দেখে বোলাররা ভয় পান, আর দর্শকরা আনন্দে মেতে ওঠেন। মিডলসেক্স টসে জেতা মানেই ব্র্যাডম্যানের ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামার অনেক দেরী। কিন্তু উপায় নেই। সে দেরী সহ্য করতেই হবে।

মিডলসেক্স মাত্র ৩২ রানের মধ্যে তিনটি উইকেট হারালো। কিন্তু হেনড্রেন তখন উইকেটে। তৃতীয় উইকেট পড়ার পর রবিনস এসে যোগ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। দিন কয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এম. সি. সি-র হয়ে সেঞ্চুরী করেছেন এই লর্ডস মাঠেই। ৪৫ বছর বয়স হলে কি হবে, হেনড্রেন তখনো দারুণ খেলছে। অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা বোলাররাও তাঁর বিরুদ্ধে বল করতে গিয়ে অসহায় বোধ করেন। সেদিনও তিনি গ্রিমেট, ওরিলি প্রভৃতির মতো বোলারদের পরোয়া করছিলেন না। ৩৯ রানের মাথায় গ্রিমেটের বল এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে তিনি ফস্কেছিলেন। কিন্তু উইকেটরক্ষক বারলেট বলটা ঠিক মতো ধরতে না পারায় হেনড্রেন আউট হবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। সেই খেলায় হেনড্রেন শেষ পর্যন্ত ১১৫ রান করলেন। আর রবিনস ৬১। কিন্তু এঁরা দুজন আউট হয়ে যাবার পর অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা মুড়িয়ে দিলেন মিডলসেক্সের ইনিংস মাত্র ২৫৮ রানেই। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। অর্থাৎ খেলা শেষ হতে আর দেড় ঘণ্টা (৯০ মিনিট) বাকি আছে।

দশ মিনিট পরে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংস শুরু করলো।

ব্যাট করতে এলেন উডফুল আর পনসফোর্ড। জিম স্মিথ নামে ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা একজন ফাস্ট বোলার বোলিং করতে এলেন। স্মিথ সেবারই প্রথম মিডলসেক্সের পক্ষে খেলছেন। বেশ মোটাসোটা চেহারা। দারুণ জোরে বল করেন। প্রথম বলটা উডফুল খেলতে গিয়ে ফস্কালেন, আর দ্বিতীয় বলে এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন।

এবার ব্র্যাডম্যানের আসার কথা। উডফুল প্যাভেলিয়নের মধ্যে চলে গেলেন। কিন্তু কই আর তো কেউ আসছেন না! তবে কি ব্র্যাডম্যান এই সন্ধ্যেবেলায় নামবেন না? দর্শকদের মধ্যে তাই নিয়ে গুঞ্জন। খেলার আর ৭৫ মিনিট বাকী। ব্র্যাডম্যান তাই হয়তো বিশ্রাম-টিশ্রাম নিয়ে সেই সোমবার নামবেন। এখন হয়তো নৈশ-প্রহরী দায়িত্ব নিয়ে দিনের বাকী সময় কাটাতে আসবেন।

সেই মুহূর্তে খুলে গেলো প্যাভেলিয়নের কাঁচের দরজা। এবং ছোটখাটো একটি মূর্তি ভেসে উঠলো দর্শকদের চোখে।

ঐ তো ব্র্যাডম্যান!

ব্র্যাডম্যান আসছেন, ব্র্যাডম্যান আসছেন ব্যাট করতে। সমস্ত মাঠ যেন লাফিয়ে উঠলো। হাততালিতে কান পাতা দায়। মাঠের সব মতভেদ বন্ধ করে দিয়ে সাদা ফ্লানেলের জামা-প্যাণ্ট পরা, মাথায় সেই অতি পরিচিত গাঢ় সবুজ রংয়ের ক্যাপ মূর্তিটি তখন ধীরে ধীরে উইকেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দর্শকদের এই উল্লাস দৈত্যাকৃতি জিম স্মিথকে স্পর্শই করলো না। তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলটি গোলার মত ছুটে এল ঠিক নিশানায়। বলটিতে মেশান ছিল বিলম্বিত সুইং। ব্র্যাডম্যান খেলতে গিয়ে ফস্কালেন। ভাগ্য ভালো বলটি ব্যাট ছোঁয়নি। দর্শকদের মধ্যে উঠলো হতাশার গুঞ্জন। বলটি সামান্যর জন্যে স্টাম্পে লাগেনি। পরের বলটাও ঠিক একই রকমের। ব্র্যাডম্যানও একইভাবে খেলতে গিয়ে ফস্কালেন। এক চুলের জন্যে ব্র্যাডম্যানের অফ স্টাম্প ছুঁলো না বলটি। দর্শকরা শিউরে উঠলেন।

স্লিপে দাঁড়িয়েছিলেন প্যাটসি হেনড্রেন। ব্র্যাডম্যান দু-এক পা এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত বলো তো প্যাটসি!

হাত খুলে মারতে শুরু করো।

হেনড্রেনের উপদেশ মনে ধরলো ব্র্যাডম্যানের। ঠিক বলেছে প্যাটসি। আক্রমণের জবাব পাল্টা আক্রমণেই দিতে হবে। পেটাতে হবে। ঐ জিমকেই মেরে ছাতু করে দিতে হবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্র্যাডম্যান এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। স্মিথের শেষ বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের পাশ দিয়ে মেরে একটা রান নিলেন ব্র্যাডম্যান। অপর দিক থেকে বল করতে এলেন সেণ্টপলস স্কুলের ১৮ বছরের ছাত্র পি. ই. জাজ। জাজের সেইটিই প্রথম শ্রেণীর প্রথম খেলা। এবং প্রথম ব্যাটসম্যান আর কেউ নন, স্বয়ং ব্র্যাডম্যান। ব্র্যাডম্যানকে বল করা যে কোন বোলারের কাছে এক শক্ত পরীক্ষা। আর সেদিন তিনি মেরে খেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হেনড্রেন যা বলেছেন ব্র্যাডম্যান ঠিক তাই করবেনই।

জাজ মাপা লেংথে বল করে গেলেন। কিন্তু তবু দু দুবার ব্র্যাডম্যান তাঁর বল বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। একবার কভার পয়েণ্টের মধ্যে দিয়ে আর দ্বিতীয়বার মিডঅফের পাশ দিয়ে। ব্র্যাডম্যানের ব্যাটের ঘায়ে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে পিছলে ছুটে গেল লাল টুকটুকে বলটি।

পরের ওভার জিম স্মিথের। উডফুলের মতো পনসফোর্ডও দ্বিতীয় বলে এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে গেলেন। ৯ রানে দু উইকেট। উডফুল আর পনসফোর্ড দুজনেই শূন্য রানে আউট। মাঠ তখন উত্তেজনায় টগবগ করছে। অ্যাটা ডারলিং এসে স্মিথের বাকী চারটি বল কোন রকমে ঠেকালেন। ঘড়িতে তখন ৫টা ২৩ মিনিট। খেলা শেষ হতে আর মাত্র ৬৭ মিনিট বাকী।

জাজের পরের ওভারে ব্র্যাডম্যান আবার দুটি বাউণ্ডারী হাঁকালেন। একটি কভারের মধ্য দিয়ে, অপরটি লং লেগে হুক করে। তারপর

ডারলিং স্মিথের মুখোমুখি হলেন। স্মিথের বলটা লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল ডারলিংয়ের পাশ দিয়ে। উইকেটরক্ষক পাইস কোন রকমে ছুঁলেন। তাঁর গ্লাভসে লেগে বলটা গড়িয়ে গেল। সেই ফাঁকে ব্যাটসম্যানরা দৌড়ে একটা বাই রান নিয়ে নিলেন। স্মিথকে পেটাবেন বলে ব্র্যাডম্যান প্রস্তুত হলেন। পরের বলটা লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে দু রান নিলেন তিনি। পরের বল মিড-অনের পাশ দিয়ে মেরে তিন রান নিলেন। দলের ২৩ রানের মধ্যে ২২-ই এসেছে ব্র্যাডম্যানের ব্যাট থেকে। বাকীরা তখন টিঁকে থাকার সংগ্রাম চালাচ্ছেন।

রান আসছে শুধু ব্র্যাডম্যানের ব্যাট থেকেই। পরের দু ওভারেও তাই হলো। ডারলিং স্মিথের বল মেরে তিন রান নিলেন। আর জাজের পরের ওভারে করলেন পাঁচ রান। ব্র্যাডম্যান পেলেন ওভারের শেষ বলটা খেলার সুযোগ এবং সেটিকে হুক করে পাঠিয়ে দিলেন বাউণ্ডারীতে। স্মিথের পঞ্চম ওভারে দশ রান এলো। দুই ব্যাটসম্যানের ভাগে পড়লো পাঁচটি করে রান। স্কোর তখন ৪৭। স্মিথের ঐ ওভারের শেষ বলে ডারলিং উইকেটরক্ষক প্রাইসের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। প্রাইস বলটা গ্লাভসের মধ্যে পেয়েও ধরে রাখতে পারলেন না। ডারলিংয়ের রান তখন ১৩।

মিডলসেক্সের অধিনায়ক এনথোভেন জাজকে সরিয়ে নিয়ে নিজেই বল করতে এলেন। রানের গতি রুখতেই হবে। এনথোভেন মিডিয়াম পেস বোলার। কিন্তু ছোটেন অনেকখানি। প্রায় প্যাভেলিয়নের কাছ থেকে ছুটে এসে বল করতে লাগলেন তিনি। ফলে তাঁর একটা একটা ওভার শেষ হতেই লাগতে লাগলো অনেকটা সময়। দু ওভারে তিনি সাত রান দিলেন। অপর প্রান্তে জিম স্মিথকে সরিয়ে রবিনসকে বল করতে পাঠালেন মিডলসেক্সের দলনেতা। ঘড়িতে তখন ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট। অর্থাৎ খেলা শেষ হতে আর ৩৫ মিনিট বাকী।

ব্র্যাডম্যান রবিনসকে পেটাতে শুরু করলেন। প্রথম ওভারেই দশ

রান। এর মধ্যে সাত রান জমা পড়লো ব্র্যাডম্যানের সংগ্রহে। রবিনসের পরের ওভারে তিন তিনবার বাউণ্ডারী হাঁকলেন ব্র্যাডম্যান। মিডঅফের ওপর দিয়ে দুটো আর একটা মিডউইকেট দিয়ে ছুটে গেল বাউণ্ডারীর দিকে। দ্বিতীয় চার মারার সঙ্গে সঙ্গেই ব্র্যাডম্যানের ব্যক্তিগত পঞ্চাশ রান পূর্ণ হয়ে গেল। ৪৯ মিনিটে ব্র্যাডম্যান ৫৪ রান করলেন।

ব্র্যাডম্যানের প্রতিটি মার সত্যিই দেখার মত। প্রখর তাঁর দৃষ্টি-শক্তি। দ্রুত পদচালনা। এবং কব্জির মোচড়ে ঘোরানো বলগুলো মুহূর্তের মধ্যে ছুটে যায় বাউণ্ডারীর দিকে। তাঁর ব্যাটের আঘাতে ছুটে-যাওয়া বলগুলো সামান্যর জন্যও ওঠে না মাটি ছেড়ে। ফিল্ডারদের অবাক করে দিয়ে বলগুলো ছুটে যায় মাটি কামড়ে। মিডলসেক্সের অধিনায়ক বার বার ফিল্ডিং বদল করছিলেন। কিন্তু ব্রাডম্যানের সামনে সেই ফাঁক ভরাট করা কি সম্ভব? কেউ কি কোন দিন পেরেছেন? এনথোভেন যেখানেই ফিল্ডারদের দাঁড় করান না কেন ঠিক তাঁদের পাশ দিয়ে ব্র্যাডম্যানের মারা বলগুলো ছুটে যেতে লাগলো বাউণ্ডারীর দিকে।

স্মিথের পরের ওভারে ব্র্যাডম্যান মাত্র দুটি বল খেলার সুযোগ পেলেন। তাতেই তাঁর ঘরে জমা পড়লো পাঁচ রান। রবিনস লেগ-ব্রেকের সঙ্গে গুগলি মিশিয়ে আক্রমণ শানাতে লাগলেন। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। মিড-অনের ওপর দিয়ে দু-দুবার ব্র্যাডম্যান তাঁর বল বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। তিন ওভারে তিরিশ রান দিয়ে রবিনস সরে দাঁড়ালেন।

জিম স্মিথের বদলে এবার বল করতে এলেন পিবলস। মূলত তিনি লেগ স্পিনার। কিন্তু গুগলি ছাড়তেও সিদ্ধহস্ত। তাঁর ওভারের শেষ বলটা খেলার সুযোগ পেলেন ব্র্যাডম্যান। এবং সেটি পত্রপাট পৌঁছলো বাউণ্ডারীতে। দর্শকরা তখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ব্র্যাড-ম্যানের স্কোরের তুলনা করে তাঁর শতরানের স্বপ্ন দেখছেন। ব্র্যাডম্যান তখন ৭৪ রানে অপরাজিত। এবং ঘড়িতে ছ'টা বেজে ১৩ মিনিট।

সেঞ্চুরী করতে হলে বাকী ১৭ মিনিটে তাঁকে ২৬ রান করতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে যা একরকম অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

এনথোভেনের পরের ওভারে ডারলিং একটা রানও নিতে পারলেন না। পিবলসের ওভারের দ্বিতীয় বল কাট করে ব্র্যাডম্যান একটা রান নিলেন। কিন্তু বাকী চারটি বলে ডারলিং কিছুই করতে পারলেন না। খেলা শেষ হতে তখন আর মাত্র ১২ মিনিট বাকী। এবং সেঞ্চুরি করতে হলে ব্র্যাডম্যানকে করতে হবে আরো ২৫ রান।

পরের ওভার এনথোভেনের। দর্শকরা বিরক্ত। বড্ড বেশী সময় নেন উনি। ছুটে আসছেন সেই প্যাভেলিয়নের কাছ থেকে। ব্র্যাড-ম্যান তাঁর প্রথম বলই স্কোয়ার কাট করে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। পরের দুটি বলই ছিল দারুণ। যেমন লেংথ, তেমনি নিশানা। ব্র্যাড-ম্যানের মতো ব্যাটসম্যানকেও চুপ করে থাকতে হল। ব্র্যাডম্যানের শতরান হবে না—এই সন্দেহই তখন দর্শকদের মনে দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। চতুর্থ বলে ব্র্যাডম্যান একটা রান নিলেন। অর্থাৎ পিবলসের পরের ওভার ব্র্যাডম্যানই খেলবেন। কিন্তু পঞ্চম বলটা ঠেলে দিয়েই ডারলিং ছুটে এলেন। দৌড়তে হলো ব্র্যাডম্যানকেও। কিন্তু তিনিও চুপ করে থাকলেন না। শেষ বলে নিলেন একটা রান। অর্থাৎ পিবলসকে তিনিই খেলবেন।

ব্র্যাডম্যানের রান তখন ৮১। পিবলস এলেন বল করতে। মাঠের কুড়ি হাজার দর্শক তখন উত্তেজনায় টগবগ করছেন। ব্র্যাডম্যান কি শতরান করতে পারবেন? নাকি তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে সেই সোমবার পর্যন্ত? ঘড়ির কাঁটাও যে দ্রুত ছুটছে!

পিবলসের প্রথম বল ছুটে গেল বাউণ্ডারীতে। পরের বলে এক রান। এখনো চারটি বল বাকী। ডারলিং কি পারবেন একটা রান নিয়ে ব্র্যাডম্যানকে বাকী তিনটি বল খেলার সুযোগ দিতে! সব নির্ভর করছে ডারলিংয়ের ওপর। ডারলিং তৃতীয় বলটা কভার পয়েন্টের দিকে ঠেলে দিয়েই ছুটতে লাগলেন। ব্র্যাডম্যানও প্রস্তুত ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেলেন অপর প্রান্তে। পিবলসের চতুর্থ বল

ব্র্যাডম্যান পিছিয়ে এসে মিড-অন দিয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। আর পঞ্চম বল স্কোয়ার লেগে পুল করে। ব্র্যাডম্যানের তখন ৯৪ রান। টেনেটুনে আর এক ওভার খেলা চলতে পারে। এখন সবচেয়ে আগে দরকার পিবলসের শেষ বলে একটা রান নেওয়ার। তাহলে পরের ওভারটা খেলতে পারবেন তিনি। কিন্তু এনথোভেন ফিল্ডারদের কাছা-কাছি টেনে এনে ঘিরে ফেললেন ব্র্যাডম্যানকে। কিছুতেই প্রত্যাশিত রানটা নিতে পারলেন না ব্র্যাডম্যান। অর্থাৎ এনথোভেনকে খেলবেন ডারলিং। তবে কি ব্র্যাডম্যানের শতরান হবে না? সময় আর নেই। এই ওভারটা কোনরকমে শেষ কিন্তু ডারলিং যদি আউট হয়ে যান? তাহলে খেলাও সেদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে! আশা-নিরাশার দোলায় তখন লর্ডসের কুড়ি হাজার দর্শক দুলছেন।

এনথোভেনের দ্বিতীয় বলে ডারলিং একটি রান নিলেন। এই শেষ সুযোগ। চার-চারটি বল খেলবেন ব্র্যাডম্যান। কিন্তু তৃতীয় বলটি ব্র্যাডম্যানকে কোনরকমে ঠেকাতে হল। সত্যি এনথোভেন তখন দারুণ বল করছেন। ব্র্যাডম্যানকে শতরান করতে না দেবার জন্যে তিনিও যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চতুর্থ বলে ব্র্যাডম্যান একটা রান নিলেন। ব্র্যাডম্যানের ৯৫ রান এবং ঘড়িতে ছ'টা সাতাশ। ডারলিং আউট হলেই সব শেষ। নতুন ব্যাটসম্যান এসে শেষ বলটা খেলবেন। এবং সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে ব্র্যাডম্যানের শতরানের সব স্বপ্ন।

প্যাভেলিয়নের কাছ থেকে এনথোভেন ছুটে আসছেন। দর্শকদের মনে হল বড্ড বেশী ছোটেন তিনি। দারুণ বলটা। ডারলিং পিছিয়ে এসে বলটা ঠেকাতে গেলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে সেটি সোজা চলে গেল উইকেটরক্ষক প্রাইসের হাতে।

হাউজ দ্যাট·.....

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন মিডলসেক্সের খেলোয়াড়রা। কিন্তু পর-মুহূর্তে দেখা গেল তাঁরা যেন চুপসে গেলেন। প্রাইস ক্যাচটা ফেলে দিয়েছেন। ডারলিং কোনরকমে শেষ বলটা ঠেকালেন।

সাড়ে ছ'টা বাজতে আর একটু দেরী। অর্থাৎ আরো একটা ওভার হবে। এবং ব্র্যাডম্যানই খেলবেন। এই তাঁর সুযোগ। সকলে ভেবেছিলেন জিম স্মিথকে বল করতে পাঠাবেন এনথোভেন। না, বোলার বদল করলেন না মিডলসেক্সের অধিনায়ক। পিবলসই এলেন বল করতে। শতরান করতে ব্র্যাডম্যানকে তখনো পাঁচ রান করতে হবে। পিবলস মনপ্রাণ ঢেলে বল করতে লাগলেন। প্রথম তিনটি বলের একটিও মারতে পারলেন না ব্র্যাডম্যান। খেলার অন্তিম মুহূর্তটি ঘনিয়ে এসেছে। সন্দেহ তখন দর্শকদের মনে। ব্র্যাডম্যান কি দর্শকদের খেলাচ্ছেন ? তিনি কি ইচ্ছে করেই মারছেন না ? কিন্তু ব্র্যাডম্যান তো কখনো এমন করেন না !

পিবলসের চতুর্থ বলটি কভারের মধ্যে দিয়ে ব্র্যাডম্যান বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। এই বলটিও ছিল ঠিক আগের তিনটি বলের মত। তাহলে !

৯৯ রান। আর মাত্র দুটি বল বাকী।

পঞ্চম বলটি ব্র্যাডম্যান অত্যন্ত সতর্কভাবে খেললেন। রান নেবার কোন ইচ্ছেই তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে ছটার ঘর ছুঁয়েছে।

দিনের শেষ বল করতে আসছেন পিবলস।

মাঠের কুড়ি হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আর একটি রান দরকার। মাত্র একটি। শেষ বলেই যেন সেটি হয়।

পিবলসের শেষ বল। কিন্তু ও কি ? ব্র্যাডম্যান যে মারার কোন চেষ্টাই করলেন না। ব্যাটটা যেন নড়লই না। মৃদু আঘাত। কিন্তু বলটা মিড-অনের গজ খানেক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বলটি কেউ ধরার আগেই ছুটে এসেছেন ডারলিং। ব্র্যাডম্যানও পৌঁছে গেছেন অপর প্রান্তে।

ব্র্যাডম্যান পেরেছেন। তাঁর নামের পাশে তখন একের পিঠে দুটো শূন্য জ্বলজ্বল করছে। কুড়ি হাজার দর্শকের উচ্ছ্বাস আর আনন্দ-উল্লাসের ভিড় ঠেলে সেই ছোটখাটো মানুষটি তখন ফিরে চলেছেন প্যাভেলিয়নে…… !

লর্ডস ঃ প্রথম দিন ঃ শনিবার, ২৬শে মে

১৯৩৪

মিডলসেক্স

ডব্লিউ এফ প্রাইস ক ও ব ওরিলি	২৩
জি ই হার্ট ব এবেলিং	১
জে গুলম ব এবেলিং	০
ই হেনড্রেন ব ওয়াল	১১৫
আর রবিনস এল বি ডব্লিউ ব গ্রিমেট	৬৫
জি সি নিউম্যান স্টাঃ বারনেট ব গ্রিমেট	০
জি ও অ্যালেন এল বি ডব্লিউ ব ওরিলি	৪
এইচ এনথোভেন এল বি ডব্লিড ব গ্রিমেট	১৩
জে স্মিথ ব ওয়াল,	১৩
পি জাজ এল বি ডব্লিউ ব ওয়াল	০
আই পিবলস অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	২২
	২৫৮

বোলিং ঃ

ওয়াল	১৬-৩-৪১-৩
এবেলিং	১৮-৫-৩৭-২
ওরিলি	১৮-৪-৫৬-২
গ্রিমেট	১৯.২-২-৮০-২
ডারলিং	৪-০-২২-০

অস্ট্রেলিয়া

ডব্লিউ এম উডফুল এল বি ডব্লিউ ব স্মিথ	০
ডব্লিউ এইচ পনসফোর্ড এল বি ডব্লিউ ব স্মিথ	০
ডি জি ব্র্যাডম্যান অপরাজিত	১০০
এল এস ডারলিং অপরাজিত	৩৩
অতিরিক্ত	২
(২ উইঃ)	১৩৫

বোলিং :

এনথোভেন	৫-১-১৬-০
জে স্মিথ	৯-১-৩৪-২
জাজ	৪-০-২৬-০
রবিনস	৩-০-৩০-০
পিবলস	৪-০-২৭-০

(পরের দিন রবিবার ছিল খেলার বিরতি। সোমবার অস্ট্রেলিয়া ৩৪৫ রানে তাদের ইনিংস শেষ করে। ব্র্যাডম্যান করেছিলেন ১৬০ রান। এর পর ১১৪ রানে মিডলসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংস মুড়িয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সেই খেলায় দশ উইকেটে জিতে যায়।)

সোবার্স তখনো স্যার হননি। নেহাতই গ্যারী বা গারফিল্ড। কিন্তু মেজাজটি তাঁর 'স্যার'দের মতই। কখনো দারুণ সিরিয়াস, কখনো হাসি-খুশী, হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠেন। রাগ-টাগ চট করে করেন না।

সেই সোবার্স সেবার রেগে আগুন।

প্যাভেলিয়নে ফিরে এসে হাতের ব্যাটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর বসলেন তল্পিতল্পা গুছোতে। ম্যানেজার বার্কলে গ্যাসকিন হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন। সোবার্স তাঁকে দেখে ফুঁসে উঠলেন। বললেন,

"আমি ইংলণ্ডে চলে যাচ্ছি। এ দেশে আর খেলবো না।"

হাঁ হাঁ করে উঠলেন গ্যাসকিন। ছুটে এলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অন্য খেলোয়াড়রা। তাই কখনো হয়। সফরের তখনো অর্ধেক বাকী। এখনই কি আর গ্যারীর মত খেলোয়াড়ের ফিরে যাওয়া চলে? সব কিছুই যে তাহলে আপ-সেট হয়ে যাবে।

গ্যারীর মুখ রাগে থমথম করছে। রাগে ফুঁসছেন তিনি। আর এক মুহূর্তও তিনি সে দেশে থাকতে চান না। ক্রিকেট খেলা নিয়ে এই রকম অনাচার সোবার্সের খেলোয়াড় মন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য তিনি করতে চান না। ও কাজ কি কোন সাচ্চা খেলোয়াড় করতে পারেন?

গ্যাসকিন অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে গ্যারীকে বোঝালেন। তাঁকে শান্ত করলেন। সোবার্স কি অমন কাজ করতে পারেন যার জন্যে ক্রিকেট খেলা ছোট হয়ে যায়! ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বদনাম হয়! সোবার্স ইংলণ্ডে ফিরে যাবার বাসনা ত্যাগ করলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যানেজার বার্কলে গ্যাসকিন। তিনি অবশ্য

ভালভাবেই জানতেন যে গ্যারীকে ওরা কিছুতেই খেলতে দেবে না। যত তাড়াতাড়ি হোক ছলে বলে কৌশলে ওরা সোবার্সকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দেবেই দেবে। আর সোবার্সও ক্ষেপে যাবেন।

ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক।

১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এসেছিল ভারত সফরে। দারুণ খেললেন সোবার্স। করলেন হাজারের ওপর রান। সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনটি টেস্টে—কানপুরে ১৯৮, বোম্বাইয়ে অপরাজিত ১৪২ ও কলকাতায় অপরাজিত ১০৬ রান। ফলে আত্মবিশ্বাসে গ্যারী তখন ভরপুর। অটুট মনোবল।

ভারত সফর শেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাচ্ছে পাকিস্তান ভ্রমণে। তিনটি টেস্ট খেলবে সেখানে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্যারী সেঞ্চুরি করেননি, এবার করবেন নিশ্চয়ই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সোবার্স।

সোবার্স আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এক ভদ্রলোক তাঁকে বলছিলেন, ভারতে তুমি যত ভালই খেলে থাকো না কেন পাকিস্তানে একদম সুবিধে করতে পারবে না। ভদ্রলোকের কথায় কানই দেননি গ্যারী। ভেবেছিলেন, ভারতের এই সাফল্য তাঁকে আরো ভাল খেলার দিকে এগিয়ে দেবে।

সোবার্স বুঝতে না পারলেও ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যানেজার বার্কলে গ্যাসকিন। সোবার্সকে খেলতে না দেবার জন্যে তলে তলে যে একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। সোবার্সকে কিছুতেই খেলতে দেওয়া হবে না।

সোবার্সের নিজের লেখা থেকেই তুলে দিচ্ছি :

'করাচি টেস্টে আমি যখন খেলতে নামলাম ফজল মামুদ তখন বল করছেন। ফজল মস্ত বোলার। আমি যে সব বোলারদের বিরুদ্ধে খেলেছি ফজলকে তাঁদের মধ্যে অন্যতম সেরা হিসেবে চিহ্নিত করতেই হবে। তাই আমি একটু সতর্ক হয়েই খেলছিলাম। ফজলের একটা বল আমি পা বাড়িয়ে খেলতে গেলাম। বল এসে লাগলো আমার

প্যাডে। আবেদন জানালেন পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা। পাক খেলোয়াড়দের আবেদন জানাতে দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তার চেয়েও বেশী অবাক হলাম আম্পায়ারের দিকে চোখ পড়তেই। তাঁর আঙ্‌ুল ওপরে উঠে গেছে। আমি আউট। ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছিল। তারপরই পা বাড়ালাম প্যাভেলিয়নের দিকে। অথচ আমি ভালভাবেই জানতাম যে বলটা আমার প্যাডে না লাগলে উইকেটে কিছুতেই লাগতো না। এত বাইরে দিয়ে যেত যে উইকেটের পাশে আরো তিনটি স্টাম্প পুঁতলেও বলটি তার ধার-কাছ দিয়েও যেত না। তবু আমাকে এল. বি. ডব্লিউ হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যেতে হল।

দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ব্যাট করতে নামলাম। কোলি স্মিথ তখন উইকেটে। ওর সঙ্গে খেলতে আমার খুবই ভাল লাগে। মনে দারুণ স্ফূর্তি। প্রথম ইনিংসে আমাকে ঐভাবে আউট দেবার কথা আর মনেই রাখিনি। ফজল মামুদ বল করতে এলেন। ফজলের হাতে বল দেখে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। খুব সতর্ক হলাম। কিন্তু যেই ফজলের একটি বল আবার প্যাডে লেগেছে, অমনি আমায় আউট দেওয়া হল।

আমি থ! এ কি কাণ্ড রে বাবা! আম্পায়ার মহাশয় কি দেখেন-নি যে বলটা প্যাডে লাগার আগে আমার ব্যাট ছুঁয়ে এসেছিল? ব্যাটে লাগার পর বল প্যাডে লাগলে এল. বি. ডব্লিউ. হয় নাকি? কিন্তু আম্পায়ারের রায়ে আমি আউট। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে আমি প্যাভেলিয়নের পথে পা বাড়ালাম। ফেরার পথে কোলির দিকে তাকালাম। ও তখন ফজলকে কি যেন বলছে।

আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। দু ইনিংসেই ভুল করে যে আমায় আউট দেওয়া হয়নি তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি। তাহলে আর এখানে থেকে কি হবে? আমায় তো কিছুতেই খেলতে দেওয়া হবে না।

ড্রেসিং রুমে খানিকক্ষণ বসেছিলাম আমি। তারপর শুরু করলাম

জিনিসপত্তর গুছোতে। না, পাকিস্তানে আর থাকবো না। আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি।

ম্যানেজার গ্যাসকিন ছুটে এলেন। ছুটে এলো অন্য খেলোয়াড়রা। তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। কথাবার্তায় মাথার গরম ভাবটাও কেটে গেল। গ্যাসকিনের সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্কটর্ক করার পর পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করলাম।

কিন্তু ঢাকা টেস্টেও ঘটলো একই কাণ্ড। ফজলের বল আমার পায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমায় এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যেতে হল। হলপ করে বলছি সে বলটা স্টাম্পের অনেক অনেক বাইরে ছিল। তারপর ঘটলো আর এক কাণ্ড। পিচের মধ্যে পা থাকা সত্বেও আলেকজাণ্ডারকে স্টাম্প আউট দেওয়া হল। ও তো রেগে আগুন।

আমার জীবনে সেই প্রথম আমি আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলাম। না করেই বা কি করবো। আমি তো বুঝতে পেরেছিলাম, আম্পায়ারা ভুল করছেন না। ইচ্ছে করে, চক্রান্ত করে আমায় আউট দিচ্ছেন।

আমার তখন মনে পড়লো সেই ভদ্রলোকের কথা। খুব অবাক হলাম। কি করে যে তিনি ঐরকম নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—তিনিই জানেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে পাকিস্তানের খেলোয়াড় আর আম্পায়ারদের মন তিনি ভালভাবেই জানতেন। কারণ এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আমরা পাকিস্তানে আসার আগেই সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছিল। চক্রান্ত করা হয়েছিল—আমাকে কিছুতেই খেলতে দেওয়া হবে না। আমি ব্যাট করতে এলে যে ভাবেই হোক আমাকে আউট করে দেওয়া হবে।'

সুতরাং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি তো দূরের কথা—মোটে রানই পেলেন না। বরং বলা ভাল যে তাঁকে মোটে খেলতেই দেওয়া

হল না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে আমাদের এক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সেবার পাকিস্তান গিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। সোবার্স টেস্টের পর টেস্টে পাকিস্তানের বোলারদের সব কারিকুরি ভোঁতা করে দিয়ে তিনটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন আর কিংসটনে উপহার দিয়েছিলেন ৩৬৫ রানের অপরাজিত ইনিংসটি। উনিশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬৪ রান করে লেন হাটন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের সেই নজির ডিঙিয়ে গেলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ ব্যাটসম্যান গ্যারি সোবার্স। কিংসটনের সাবিনা পার্কে আবির্ভাবেই তুরন্ত খেলা খেললেন। করলেন প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি এবং ট্রিপলও বটে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্যারী খেলা শুরু করেছিলেন ঝড়ের বেগে। পাকিস্তানের কোন বোলারকেই তিনি বিন্দুমাত্রও পরোয়া করেননি। রানের বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন মাঠ। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন শ'য়ের ঘরে। সেঞ্চুরি করার পর আবার যেন গোড়া থেকে খেলতে শুরু করলেন সোবার্স। টিয়ের পর ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ হল। প্রথম দিনের খেলা যখন শেষ হল তখন স্কোর বোর্ডে সোবার্সের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ২২৬ রানের একটি অনবদ্য ইনিংসের কাহিনী।

সোবার্সের মনে তখন স্বপ্ন। উনিশ বছর আগে গড়া লেন হ্যটনের ৩৬৪ রানের রেকর্ড তাঁকে ভাঙতে হবে। মন তাঁর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। মনের মধ্যে মস্ত ঐ স্বপ্নটা প্রতি মুহূর্তে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাঁকে করতেই হবে—যেভাবেই হোক নজির গড়া ইনিংস তাঁকে খেলতে হবে।

সারারাত সোবার্স উত্তেজনায় ঘুমোতে পারলেন না। অস্থির মন। দু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। শেষ রাতে একটু তন্দ্রা এসেছিল। তাও বেশীক্ষণের জন্যে নয়। উঠে পড়লেন। চানটান করে রেডি হয়ে নিলেন। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিলেন সোবার্স। হ্যাঁ, তাঁকে ঐ অসাধ্য সাধন করতেই হবে। ২২৬ রান করেছেন। করতে হবে আরো ১৩৮ রান। ছুঁতে হবে লেন হাটনের রেকর্ড। তারপর ডিঙিয়ে যাবেন। গড়বেন বিশ্ব ক্রিকেটের অবিস্মরণীয় নজির।

দ্বিতীয় দিন সকালে কনরাড হাণ্টের সঙ্গে সোবার্স যখন প্যাভেলিয়ন থেকে বেরুলেন সাবিনা পার্কের কুড়ি হাজার মানুষ তখন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরাও কি টের পেয়েছেন সোবার্সের মনের কথা ? সে যে এখনো অনেক দূর—অনেক পথ পার হয়ে তবেই ছুঁতে হবে লেন হাটনের ৩৬৪ রানকে।

কিন্তু স্নায়ুর এতটুকুও চাপ ছিল না সোবার্সের খেলায়। ধীরস্থির ভাবে খেলে চলেছেন। রান উঠছে দ্রুত। একদিকে হাণ্ট, অন্যদিকে সোবার্স। দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে গেলো সোবার্সের ট্রিপল সেঞ্চুরি। দৃঢ় পদক্ষেপে এবার তিনি এগিয়ে চলেছেন অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে। হাণ্ট চেষ্টা করছেন সোবার্সকে বেশী খেলার সুযোগ দিতে। সেই কাজ করতে গিয়েই আচমকা রান আউট হয়ে গেলেন হাণ্ট।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে। জুটি ভেঙে গেছে। দুজনে খেলেছেন অনেকক্ষণ। এবার না সোবার্স আউট হয়ে যান। তখন উইকেটে এসে সোবার্সের পাশে দাঁড়িয়েছেন এভারটন উইকস। সোবার্সের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন তারপর ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে পেটাতে শুরু করলেন পাকিস্তানের বোলারদের। জহ্লাদের খড়্গের মত যেন উইকসের হাতে ব্যাট। দেখতে দেখতে ৮৪ রান করে ফেললেন উইকস। তারপর আউট হয়ে গেলেন। এলেন বিশ্ব ক্রিকেটের 'থ্রি ডব্লিউয়ের' আর এক পুরুষ—ওয়ালকট। সোবার্সও তখন তাঁর লক্ষ্যের কাছাকাছি।

ওয়ালকট এসে সোবার্সকে বললেন, "জেরি ডিক্লেয়ার করার কথা ভাবছে। চটপট ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটি করে ফেলো।"

তারপর বললেন, "তাই বলে যেন তাড়াহুড়ো করতে যেও না। এদিকে আমি আছি। যতটা সম্ভব তোমায় খেলার সুযোগ করে দেবো।"

সোবার্স আবার এগিয়ে চললেন। দুরন্ত খেলা। বিশ্ব রেকর্ডের দোরগোড়ায় পৌঁছেছেন—কিন্তু এতোটুকুও আড়ষ্টতা নেই। অথচ তাবড় সব ব্যাটসম্যানরা সেঞ্চুরির মুখে এসে থমকে দাঁড়ান। নব্বুই

থেকে শতকে পৌঁছতে কত যে সময় নেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু গ্যারী অনন্য। অসাধারণ তাঁর খেলা।

দেখতেদেখতে পৌঁছে গেলেন ৩৬৩ রানে। আর মাত্র একটি রান। তাহলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন লেন হাটনকে। তাঁর আর একটি— এবং বিশ্ব রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির গড়বেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্স।

এমন সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক হানিফ মহম্মদের হাতে বল তুলে দিলেন। হানিফ ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ব্যাট হাতে নিয়ে অনেক রান তিনি করতে পারেন। কিন্তু বল করতে কি তিনি পারেন? অন্তত সোবার্স তো সে কথা জানতেন না? কি রকম বল করেন তিনি? হানিফের হাতে বল দেখে সতর্ক হলেন গ্যারি। সংযত হলেন। হঠাৎ কিছু করতে যাবার দরকার নেই। দরকার নেই তাড়াহুড়ো করার। দেখে শুনে বুঝে খেলতে হবে হানিফকে।

হানিফ বল করলেন। সোবার্স বলটা বাউণ্ডারির দিকে পাঠিয়েই ছুটতে শুরু করলেন। ওদিক থেকে ধেয়ে এলেন ওয়ালকট।

এক রান……ছুটছেন সোবার্স, ছুটছেন ওয়ালকট……দু রান… এবং বিশ্ব রেকর্ড।

সোবার্স ৩৬৫ রানে অপরাজিত।

উনিশ বছর আগে তেরো ঘণ্টারও বেশী সময় নিয়ে ৩৬৪ রান করেছিলেন হাটন। ঘণ্টা দশেকের চেষ্টায় সেই রেকর্ড ডিঙিয়ে গেলেন গ্যারী।

দর্শকরা ততক্ষণে নেমে পড়েছেন মাঠে। তুলে নিয়েছেন সোবার্সকে কাঁধে। সাবিনা পার্কের হাজার কুড়ি দর্শকের উচ্ছ্বাসে কিংসটনের আকাশ-বাতাস তখন ম-ম করছে। আনন্দে উদ্বেল তাঁরা। মাঠে নেমে নাচছেন। গাইছেন। হা হা করে হাসছেন। তাঁদের ছোট্ট গ্যারী বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। ভেঙে দিয়েছে ইংলণ্ডের লেন হাটনের রেকর্ড। সাবিনা পার্কে সৃষ্টি হল ইতিহাস। তার সাক্ষী ঐ কুড়ি হাজার দর্শক। সুতরাং তাঁদের আনন্দ তো হবেই।

সোবার্স কিন্তু ঐ অপরাজিত ৩৬৫ রানের ইনিংসটিকে তাঁর সেরা খেলা বলে মনে করেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, ঐ টেস্টে পাকিস্তানের বোলিংয়ের ধার অনেক কমে গিয়েছিল। নসিমুল গণি, মামুদ হোসেন আহত। কারদারের চোট। তাহ'লে—

কিন্তু ঐ ৩৬৫ রানের স্মৃতি সাবিনা পার্কের দর্শকরা কি কোনদিন ভুলতে পারবেন? আর আমরা পরিসংখ্যানের পাতায় দেখবো—বড় বড় হরফে লেখা—গ্যারী সোবার্সের বিশ্ব রেকর্ড গড়ার ইনিংসটির কথা।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আমরা বিশ্ব ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ অল রাউণ্ডার গারফিল্ড সোবার্সের পরিসংখ্যানের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সোবার্স ৯৩টি টেস্ট খেলেছেন। ১৬০ ইনিংসে ২১ বার অপরাজিত থেকে করেছেন মোট ৮০৩২ রান। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৩৬৫। সেঞ্চুরি করেছেন ২৬ বার। ইনিংস প্রতি তাঁর গড় রান ৫৭·৭৮। আর টেস্ট খেলায় ক্যাচ লুফেছেন ১১০টি।

আর ৯৩টি টেস্টে সোবার্স ২১৫৯৯ টিবল করেছেন। মেডেন পেয়েছেন ৯৭৩ ওভার। ৭৯৯৯ রানের বিনিময়ে পেয়েছেন ২৩৫টি উইকেট। এক ইনিংসে ৫টি বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন ৬ বার। উইকেট প্রতি গড় রান দিয়েছেন ৩৪·০৩।

১৯৪৯-৫০ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত ভ্রমণের কথা ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এম. সি. সি. কর্তৃপক্ষ সে সফর বাতিল করে দিলেন। আর তখনই সৃষ্টি হলো কমনওয়েলথ্ দলের। ইংলণ্ড দল ভারতে না আসায় কমনওয়েলথ্ দেশগুলোর খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথ্ দল এলো ভারত ভ্রমণে।

অস্ট্রেলিয়ার জর্জ লিভিংস্টোনের ওপর পড়লো কমনওয়েলথ্ দল পরিচালনার ভার। সে দলে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ন'জন খেলোয়াড়—লিভিংস্টোন, অ্যালেন পেপার, ফিটজামাউরিস, পেটিফোর্ড, ক্রেয়ার, ল্যাম্বার্ট, ল্যাংডন ও ট্রাইব; ইংলণ্ডের পাঁচজন—ডাকওয়ার্থ, ওল্ডফিল্ড প্লেস, পোপ ও রয় স্মিথ; আর ওয়েস্টইণ্ডিজের ওরেল ও হোল্ট।

পাঁচটি বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ নিয়ে সেই সফরে কমনওয়েলথ্ দল অংশ গ্রহণ করছিলো মোট ২১টি খেলায়। এর মধ্যে তাদের জয় দশটি খেলায়, ন'টি খেলা শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে আর পরাজিত হলো মাত্র দু'টি খেলায়।

কিন্তু সে মরশুমে 'রাবার' জিতেছিলো ভারতই। মাদ্রাজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে খেলা শেষ হবার মাত্র এগারো মিনিট আগে বিজয়লক্ষ্মী ভারতের গলায় পরালেন জয়মাল্য। সেই টেস্টে উভয় ইনিংসে বিজয় হাজারের আকর্ষণীয় ব্যাটিং আর উমরিগড় ও আহত মুস্তাক আলীর প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য ভারতকে নিয়ে গেলো জয়লাভের পথে।

এই সফরটিও ওরেলের ক্রীড়ানৈপুণ্যে ভরা। মোট ১৬৪০ রান করে ওরেল ব্যাটিং তালিকার শীর্ষে ছিলেন। আর টেস্ট খেলার ন'টি ইনিংসে করলেন ৬৮৪ রান, যার গড় হিসেব ৯৭·৭১ রান। তার মধ্যে আছে তাঁর কানপুর টেস্টের ২২৩ রান।

অধিনায়ক জন গাডার্ডের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে ১৬ জন খেলোয়াড়

সম্বলিত দল নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এলো ইংলণ্ড ভ্রমণে। শক্তিশালী সে দল। দলে ছিলেন স্টলমেয়র, গোমেজ, ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, পেরী, জনসন, জোন্স, উইলিয়ামস, মার্শাল, ক্রিস্টানী, ট্রেসট্রেল, রে, রামাধীন আর ভ্যালেনটাইন।

অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল খেলেছিলো এই মরশুমে। পাঁচ দিন ব্যাপী চারটি টেস্ট ম্যাচে তারা ৩-১ খেলায় জিতে 'রাবার' নিজেদের দখলেই রাখতে সমর্থ হলো। আর অন্যান্য ৩১টি খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতলো ১৭টিতে, পরাজিত হয়েছিলো ৩টিতে আর ১১টি খেলা শেষ হলো অমীমাংসিত ভাবে।

কিন্তু ওল্ড ট্রাফোর্ডের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজিত হলো। থ্রি ডব্লিউ-এর কেউই সে খেলায় নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হলেন না তবে প্রথম টেস্টে পরাজয়ের স্মৃতি দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে যোগালো অপরিসীম অনুপ্রেরণা। ৩২৬ রানে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।

ওরেল প্রথম ইনিংসে ৫২ আর দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ৪৫ রান। সেঞ্চুরী করলেন রে আর ওয়ালকট। দু' ইনিংসেই উইকস করলেন ৬৩ করে। আর বোলিং-এ ভেল্কি দেখালেন কুড়ি বছরের দুই ছোকরা রামাধীন আর ভ্যালেনটাইন

খেলার ফলাফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালো কালো মানুষগুলো আহ্লাদে আটখানা। ছেলেমেয়ে সবাই নেচে গেয়ে একশেষ। তারা গাইল—

'Yardlv tried his best, Goddard won the Test
with those little pals of mine,
Ramadhin and Valentine.'

Centuries by Rae and Walcott :
'Rae had confidence while Walcott licked
them round the fance.'

Not forgetting that :
'The king was there well attired,
So they started with Rae and Stollmeyer.'

পরের খেলা লিস্টারশায়ার কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে। প্রথম দিনেই

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো ২ উইকেটে ৬৫১ রান। তাদের মারের বহর দেখে কাউন্টি দলের খেলোয়াড়রা থ! আম্পায়ার ছিলেন ফ্রাঙ্ক চেস্টার। তাদের বিস্ময় দেখে হেসে বললেন, 'এখনো তো কিছুই হয়-নি, এবার আসবে উইকস!'

এলেন উইকস। পরমুহূর্তে ওরেলের সঙ্গে মাঠে বইয়ে দিলেন রানের বন্যা। মাত্র ৬৫ মিনিটে উইকস করলেন নিজস্ব শতরান আর দু'জনে মিলে এক'শ আশি মিনিটের কাছাকাছি সময়ে করলেন ৩৪০ রান।

মাঠে তখন কাউন্টি দলের খেলোয়াড়দের আর্তনাদ। বিধ্বস্ত খেলোয়াড়রা স্তব্ধ! কিন্তু আম্পায়ার চেস্টার হাসছেন। কাউন্টি দলের হতবাক খেলোয়াড়দের বললেন, 'এখনও অর্ধেক বাকী—ওয়ালকটকে এখনো দেখোনি!'

সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে কাউন্টি দলের খেলোয়াড়রা।

দয়া হল গাডার্ডের। পরের দিন ২ উইকেটে ৬৮২ রানের মাথায় ইনিংসের সমাপ্তি ডিক্লেয়ার করে দিলেন তিনি। ওরেল ২৪১ আর উইকস ২০০ রানে রইলেন অপরাজিত আর মার্শাল করলেন ১৮৮ রান।

টেণ্ট ব্রীজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচকে ওরেলের টেস্ট বললেও বোধ হয় সবটা বলা হবে না।

ইংলণ্ডের ২২৩ রানের প্রথম ইনিংসের উত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো ৫৫৮ রান। ওরেল আর উইকস এই খেলায় দেখালেন অবিস্মরণীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য। ওরেল করলেন ২৬১ রান আর উইকস ১২৯। ওরেল আর উইকস-এর জন্যে পর পর দু'টি খেলায় জয়লাভের গৌরব অর্জন করলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।

ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো সে মরশুমের চতুর্থ ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন ২-১ খেলায় এগিয়ে আছে। সিরিজ পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে টেস্টে ইংলণ্ডকে জিততেই হবে। কিন্তু খেলার ফলাফল শেষ পর্যন্ত হলো অন্যরকম।

ওরেলের প্রশংসনীয় ১৩৮ রান আর রামাধীন ও ভ্যালেনটাইনের মারাত্মক বোলিং-এর জন্য ইংলণ্ডকে পরাজয় বরণ করতে হলো।

ইংলণ্ড সফরে প্রথম শ্রেণীর খেলায় থি্ ডব্লিউ-এর খতিয়ান—

খেলা—ইনিংস	নঃ	আঃ	রান	সর্বোচ্চ	গড়
উইকস— ২৩	৩৩	৪	২৩১০	৩০৪	৭৯·৬৫
ওরেল — ২২	৩১	৫	১৭৭৫	২৬১	৬৪·২৬
ওয়ালকট—২৫	৩৬	৬	১৬৭৪	১৬৮	৫৫·৮০

মরশুমের চারটি টেস্ট খেলার খতিয়ান—

ওরেল— ৪	৬	০	৫৩৯	২৬১	৮৯·৮৩
উইকস— ৪	৬	০	৩৩৮	১২৯	৫৬·৩৩
ওয়ালকট— ৪	৬	১	২২৯	১৬৮	৪৫·৮০

১৯৫০-৫১ সালে কমনওয়েলথ্ দল দ্বিতীয়বার এলো ভারত সফরে। ইংলণ্ডের লেসলী এমস হলেন দলের অধিনায়ক। আর সহ-অধিনায়কতার দায়িত্ব পড়লো ফ্রাঙ্ক ওরেলের ওপর। দলের খেলোয়াড় তালিকায় ছিলেন—জে আইকিন, আর স্পুনার, জি এমেট, কে গ্রিভিস, এইচ গিমবেল্ট, বি ডোলাণ্ড, এল. ফিসলক, জি ট্রাইব, ডি স্যাকেলটন, এ বারলো, জে লেকার, আর রিজওয়ে, এস রামাধীন, ই পেণ্টার ও এল জ্যাকসন। তবে লেকার, স্পুনার আর জ্যাকসনকে আহত হয়ে দেশে ফিরে যেতে হয়। আর তাঁদের বদলে সাটক্লিফ, ডোভে আর স্টিফেনসন এসে ভারত সফরকারী কমনওয়েলথ্ দলের সঙ্গে যোগ দেন।

পাঁচটা বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ সহ কমনওরেলথ্ দল মোট ২৭টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। টেস্ট ম্যাচ পাঁচটির তিনটি খেলা ড্র হলো আর বাকী দুটিতে জিতে কমনওয়েলথ্ দল ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো তাদের আগের সফরে হারানো রাবার।

এই মরশুমেও ফ্রাঙ্ক ওরেলের সাফল্য বিস্ময়কর। ১৯০০ রান করে তিনি সব থেকে বেশী রান করার গৌরব লাভ করেন। বোলিং-এও ফ্রাঙ্কের সাফল্য এবার চরম। পাঁচটি বেসরকারী টেস্টে ফ্রাঙ্ক দখল করেছিলেন মোট ১৮টি উইকেট।

গাডার্ডের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুঁজে পেয়েছে তাদের নতুন অধিনায়ককে। যিনি খেলতে জানেন, খেলাতে জানেন আর জানেন খেলোয়াড়দের ভালোবাসতে।

গাডার্ড ১৯৫১-৫২ সালে তাঁর দল নিয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়া সফরে। এক বছর আগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'রাবার' জয়ের বিজয়মাল্য তাঁর গলায় দুলছে। আর তাঁর দলে আছে সেরা তিন ব্যাটসম্যান ওরেল, উইকস আর ওয়ালকট। আর আছেন রামাধীন ও ভ্যালেনটাইন— এক বছর আগে ইলেণ্ডের মাটিতে যাঁরা দেখিয়ে এসেছেন ভেল্কি।

ওরেল জিনিয়াস, উইকস মেসিন আর ওয়ালকট—অপরিসীম তাঁর রানের ক্ষুধা। কিন্তু রাম আর ভ্যাল ? তাদের কথা এখন থাক।

তবু শুভ সে সফরে দেখা গেলো অশুভের ছোঁয়া। নতুন বল—বোলার হিসেবে ওরেলকে খুঁজে পাওয়া গেলেও বিশেষ দেখা গেলো না ওরেলের সেই স্বভাবলব্ধ ব্যাটিং নৈপুণ্যতা। নিজেকে খুঁজে পেলেন না ওরেল, কিংবা পেয়েও পারলেন না ধরে রাখতে।

তবু সাময়িক চমকে চমৎকৃত করে তুলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের। ওরেল প্রতিভার চরম প্রকাশ দেখে তাঁরা ভেবেছিলেন ট্রাম্পারের কথা।

প্রাথমিক কয়েকটি খেলার পর ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়াল, মিলার, জনস্টন, জনসন আর রিংকে সেই প্রথম দেখলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা।

টসে জিতে গাডার্ড প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সূচনায় বিপর্যয়! মাত্র ১৮ রানের মধ্যে রে আর স্টলমেয়র আউট। ওরেল আর উইকস শুরু করলেন এক সঙ্গে খেলতে। উইকস ৭০ মিনিট খেলে করলেন ৫০ রান। কিন্তু জনস্টনকে এগিয়ে মারতে গিয়ে

ওরেল স্টাম্পড হলেন। শেষ পর্যন্ত গাডার্ডের প্রশংসনীয় ব্যাটিং-এর জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হলো ২১৬ রানে।

ভ্যালেনটাইন আর রামাধীনের মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াও সুবিধে করতে পারলো না। কিন্তু কয়েকবার আউট হবার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে লিণ্ডওয়াল ৬১ রান করায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলো ২২৬ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ওরেল স্টাম্পড আউট হলেন। একমাত্র উইকস ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরা, সকলেই দিলেন ব্যর্থতার পরিচয়। উইকসের ৭০ রানের জন্যে ২৪৫ রানে শেষ হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস।

তারপর শুরু হলো এক অবিস্মরণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রামাধীন আর ভ্যালেনটাইনের বলে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা চোখে সরষের ফুল দেখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হলো না। হ্যাসেট ৬৯, মরিস ৪০ আর হার্ভে ৪২ রান করায় অস্ট্রেলিয়ার হাতে ৩টি উইকেট থাকতে তারা পার করে দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান সংখ্যা। রামাধীন ৯০ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট।

তবু অস্ট্রেলিয়া সে খেলায় জিতলো ৩ উইকেটে।

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে একটি ঘটনা ঘটেছিলো। ওরেল-চরিত্র বুঝতে হলে ঘটনাটি জানার প্রয়োজন আছে। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে ওরেলের নিজের লেখা থেকেই কিছু অংশ তুলে দিলাম।

"The incident in which I was involved began on the field in the Brisbane Test 'match. I was batting with Everton Weekes with about five minutes to go before stumps were drawn. I went down to Everton and told him to stay at his end and I would play out the over at mine. This was agreed. I returned to the crease to face Doug Ring and something that I cannot explain happened. Ring bowled a ball which was a

leg spinner and wide of the off stumps—a ball I had no need to play at, but as if I were drawn out of my crease by some supernatural force I just found myself moving down the wicket attempting a defensive stroke to the ball. I was stumped and had no explanation to give in the light of my intentions and discussions with Everton Weekes a minute before. John Goddard, as night watchman, walked to the wicket in a *huff*, immediately received a full toss from Doug Ring and played the most 'un-night watch manlike' stroke have ever seen. He drove it back into Ring's hands and was caught.

The following morning (a Sunday) I was alone in the elevator at Lennons Hotel, Brisbane, going down to breakfast when Goddard entered from the floor below and refused to speak. I was slightly disturbed by this attitude and it was then that I decided to be a neutralist member of the West Indian touring team. Thereafter quickly ran the boundary and fielded away from che whispering and smiles on the field when tringswere going wrong....."

তাই দেখা গেছে ব্যর্থতার নৈরাশ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা যখন স্তব্ধ, হাসি যখন ভুলে গেছে তারা, যখন মাথা নীচু করে পরাজিত দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের ব্যর্থতায় জর্জরিত হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এসেছে, তখন ওরেলের মুখে হাসির ঝলক তীক্ষ্ণ পরিহাসের মতো চমক লাগিয়েছে সকলের মনে।

কিন্তু সিডনীর দ্বিতীয় টেস্টে সেই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। ব্যাটে-বলে লড়াই-এ আর একবার পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিলো অল্প অল্প; তাই টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হ্যাসেট ব্যাট করতে পাঠালেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

কিন্তু যতটা সুবিধে লাভ করবে ভেবেছিলো অস্ট্রেলিয়া ততটা হলো না। প্রথম দিনে খেলার শেষ ৬ উইকেটের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো ২৮৬ রান। ওরেল দর্শনীয় ভাবে ব্যাটিং করে পূর্ণ করেছিলেন তাঁর অর্ধ শত রান। পরের দিন গাডার্ডের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এর জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৬২ রানে শেষ করলো তাদের প্রথম ইনিংস।

প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া করলো ৫১৭ রান। হ্যাসেট ১৩২ রান করে আউট কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলো। শুধু বিপর্যয় নয়, পরাজয়ও বটে! মাত্র ১৯০ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। ওরেল আর ওয়ালকট কিছুই করতে পারলেন না। উইকস তবু করেছিলেন ৫৬ রান।

ফলে দুটি টেস্টে এগিয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়া। শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের একি হাল! একি হাল ক্রিকেটের বিশ্ববিজয়ী 'থ্রি ডব্লিউ'-এর?

দু'টি টেস্ট এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া এডিলেডের তৃতীয় টেস্টে সম্মুখীন হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। হ্যাসেট খেলতে না পারায় মরিসের ওপর পড়লো দল পরিচালনার ভার।

কিন্তু বোলিং-এ ওরেল যে খেল দেখালেন সেবার, তার বোধ হয় তুলনা হয় না। মাত্র ১২·৭ ওভার বল করে ওরেল ৩৮ রানের বিনিময়ে পেলেন ৬টি উইকেট। আর অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র ৮২ রানে। এ ব্যাটিং বিপর্যয়ের ভাগীদার ওয়েস্ট ইণ্ডিজকেও হতে হলো। তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হলো ১০৫ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করলো ২৫৫ রান। ফলে ২৩৩ রান করলে জিতবে এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিং শুরু করলো এবং শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় জয়লাভ করলো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তখনও (২-১) খেলায় আছে এগিয়ে।

মেলবোর্নের চতুর্থ টেস্টের উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া (২-১) টেস্ট এগিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু এডিলেড টেস্ট জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফিরে পেয়েছে তাদের মনোবল, ফিরে পেয়েছে তীব্র প্রতিদ্বিন্দ্বতা চালাবার সংগ্রামী মনোভাব। তাই মেলবোর্ন টেস্টের আকর্ষণ অবর্ণনীয়।

গাডার্ড টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন। একমাত্র ফ্রাঙ্ক ওরেল ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর সব ব্যাটসম্যানরা দিলেন চরম ব্যর্থতার পরিচয়। দিনের শেষে মাত্র ২৭২ রানে শেষ হয়ে গেলো ইনিংস। এর মধ্যে ফ্রাঙ্ক একাই করলেন ১০৮ আর গোমেজ করলেন ৭২ রান।

অস্ট্রেলিয়ারও সেই একই দশা। হার্ভের দর্শনীয় ৮৩ আর মিলারের ৪৭ রান নিয়ে অস্ট্রেলিয়া কোনরকমে করলো ২১৬ রান। ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এগিয়ে থাকলো ৫৬ রানে।

নতুন আশার আলো দেখা গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শিবিরে। দেখা গেলো এই টেস্টে জেতার সম্ভাবনা। কিন্তু লিণ্ডওয়াল আর মিলারের মারাত্মক বোলিং ভেদ করে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং ব্যূহ। মাত্র ১২৮ রানের মধ্যে পড়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬টি উইকেট। শেষ পর্যন্ত গোমেজ ৫০ আর ফ্রাঙ্ক ওরেল ৩০ রান করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ হলো ২০৩ রানে।

এবার জয়লাভের সম্ভাবনা অস্ট্রেলিয়ার। ২৬০ রান করতে পারলে জিতবে তারা। দু' দলই জয়লাভের আনন্দে মেতে উঠে সম্মুখীন হলো প্রচণ্ড সংগ্রামে। কিন্তু মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হ্যাসেট। ভ্যালেনটাইন করতে লাগলেন সাংঘাতিক বোলিং। ২১৮ রানের মাথায় পড়ে গেলো ৮টা উইকেট। ১০২ রান করে হ্যাসেটও আউট হয়ে গেছেন। জেতার সম্ভাবনা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। অস্ট্রেলিয়ার শেষ

দুই ব্যাটসম্যান যখন খেলতে নামলো তখনো জেতার জন্য তাদের ৩৮ রান বাকী। কিন্তু রিং আর জনসন তাঁদের দেশের জয়লাভের জন্য দিলেন অতুলনীয় মনোবলের পরিচয়। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমস্ত আক্রমণ ধারাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রিং আর জনসন করে ফেললেন জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় রানগুলি।

চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিশ্চিত জয়লাভের মুখ থেকে জয়-মাল্য ছিনিয়ে নিলো অস্ট্রেলিয়া।

'রাবার' চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ার দখলে। তাই সিডনীর পঞ্চমটেস্টে বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিলো না। অনেকটা সেই দায়সারা গোছের টেস্ট। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করলো মাত্র ১১৬ রান। এর পেছনে ছিলো গোমেজ আর ওরেলের সাংঘাতিক বোলিং। গোমেজ ৭টি আর ওরেল পেয়েছিলেন ৩টি উইকেট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ১১৬ রানের প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো মাত্র ৭৮ রান। মিলার পেয়েছিলেন ২৬ রানে ৫টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করলো ৩৭৭ রান। ফলে জেতার জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে তখন করতে হবে ৪১৬ রান। কিন্তু সে এক অসম্ভব ব্যাপার। তবু আশা ছাড়েননি স্টলমেয়র। কিন্তু তিনি একা আর কি করবেন। স্টলমেয়র ১০৪ রান করা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২১৩ রানের বেশী করতে পারলো না। ফলে পঞ্চম টেস্টও অস্ট্রেলিয়া জিতলো। জিতলো ২০২ রানে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমেরিকা মহাদেশের তলায় ছোট-বড় কয়েকটি দ্বীপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা লাগিয়ে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালুকাবেলায়। সেখান থেকে শুরু হয়েছে নারকেল গাছের সার। দ্বীপগুলো ছেয়ে আছে নারকেল গাছে। সেই গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়বে সবুজ প্রান্তর, ছোট ছোট পাহাড়, ঘর-বাড়ি। আর চোখে পড়বে কালো কালো মানুষের মূর্তি। ছোট-বড় মেয়ে-পুরুষ মাঠে মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে। কারো হাতে ব্যাট কারো হাতে বল। ক্যালিপসোর সুর ভেসে বেড়ায় এখানে-সেখানে। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন ও যৌবনের নেশায় মত্ত নারী ও পুরুষদের গলাছাড়া হাসি কাঁপিয়ে দেয় আকাশ-বাতাস। ঐ দ্বীপগুলোতে কালো পাথর কোঁদা মানুষগুলোর সঙ্গে বাস করে কিছু ভারতীয়, চীনা আর সাদা চামড়ার সাহেব। ঐ দ্বীপগুলোর আলাদা আলাদা নাম আছে। কোনটার নাম বার্বাডোজ, কোনটা ত্রিনিদাদ, কোনটা বা বৃটিশ গিয়ানা। একত্রে বলা হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। যার ইংরেজী নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।

বৃটিশ গিয়ানার ছোট্ট একটি শহর পোর্ট মাউরেন্ট। ক'টা চিনির কারখানা আছে বলেই শহরটার যা একটু নামডাক। তা ঐ অঞ্চলের সব জায়গাতেই চিনির কল আছে। আর আছে ক্ষেত ভরা আখ। পোর্ট মাউরেন্টের অধিকাংশ লোকই চিনির কলগুলোতে কাজ করেন। সামান্য কাজ। তাই অভাব-অনটনের মধ্যেই দিন কাটে। অবস্থা প্রায় সকলেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয় গোছের।

এই শহরেরই এঁদো একটি গলিতে থাকত একটি ভারতীয় পরিবার। নামেই ভারতীয়। ছোটরা জানেও না কবে তাদের বাবা ঠাকুরদাদা ভারত থেকে এসে বাসা বেঁধেছিলেন এই দ্বীপে। ওরা এখন পুরোপুরি ঐ দ্বীপেরই মানুষ। কথাবার্তা, হাব-ভাব কোন বিষয়েই

বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যেটুকু আছে তা ঐ চেহারায়। কালো রং ঠিকই। কিন্তু ওদের মত কুচকুচে নয়। মাথা ভর্তি গোড়া মোটা কোঁকড়ান ছোট ছোট চুলও নেই। চেহারায় ওরা এখনও খাঁটি ভারতীয়।

এই রকমই একটি ভারতীয় পরিবারে ১৯৩৫ সালে ২৬শে ডিসেম্বর জন্ম হল একটি ছেলের। পাঁচ বোন, দু'ভাইয়ের সংসার। হৈ-হৈ লেগেই আছে। ভাই-বোনদের মধ্যে খুঁটিনাটি লেগে থাকতই। মার খেত ছোটটাই। মা রান্না-টান্না নিয়ে ব্যস্ত। অত বড় সংসার, কাজ তো আর কম নয়! বাবা কাজ করেন এক চিনির কলে। সকাল-বেলায় সাইকেলে চেপে সেই যে বেরুলেন—ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়। ফলে ছেলেমেয়েরা স্বাধীন। যার যা ইচ্ছে করছে, দেখার কেউ নেই।

ছোট ছেলেটার নাম কানহাই। একটু বড় হতেই গলিতে নেমে পড়ল। ওর বয়সের আরো তিনটে বাচ্চা তখন ঐ এঁদো গলিতে ঘোরাঘুরি করত। তাই চারজনে দারুণ ভাব হয়ে গেল। প্রায়ই দেখা যেত চারটি ছেলে এক সঙ্গে বসে। ওদের নাম বেসিল বুচার, জো সলোমন, আইভ্যান ম্যাডরে আর রোহান কানহাই। কানহাইদের পাশের বাড়িতে থাকতেন জন খুড়ো। ভাল নাম জন ট্রিম। দারুণ ক্রিকেট খেলতেন এক সময়। অনেকগুলো টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। বাচ্চা চারটির ওপর ছিল তাঁর নজর। ভালবাসতেন ওদের। ক্রিকেট খেলার দিকে ওদেরও যে খুব ঝোঁক এ কথাটা জানতেন বলেই বোধহয় আরো বেশী ভালবাসতেন। ভালবাসার আর একটা কারণ হল ছেলেগুলোর পারিবারিক অবস্থা। ভাল করে খেতেও যে পায় না ছেলেগুলো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভাল মানুষদের বড়ই দুর্গতি। বড্ড গরিব ওরা। জন ট্রিমও ওদেরই একজন। এই এঁদো গলিতেই তিনি জন্মেছেন, মানুষ হয়েছেন। তারপর একদিন বড় খেলোয়াড় হিসেবে

তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। তাই ঐ চারটি ছেলেকে দেখলে তাঁর মনে পড়ে যায় নিজের ছোটবেলার কথা। তাঁর মত ওদেরও ব্যাট নেই, বল নেই। নারকেল গাছের পাতা ছাড়িয়ে কেটে-কুটে নিয়ে ওরা ব্যাট বানায়। কাগজের গোল্লা বানিয়ে তার ওপর ন্যাকড়া জড়িয়ে ওরা বল তৈরি করে। তারপর গলিতে খেলে নিজেদের মনে। কেউ খেলা শেখাবার নেই, কেউ দেখিয়ে দেবার নেই। জন খুড়ো তাই চুপ করে থাকতে পারতেন না। ছুটে ছুটে আসতেন ওদের কাছে। উপদেশ দিতেন, খেলা শেখাতেন। কখনও কখনও ব্যাট বল কিনে দিতেন।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল ওরা। বয়সে জো সলোমন ছিল ওদের চেয়ে একটু বড়। সে আগেই রোমান ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কানহাই আর আইভান ভর্তি হল ঐ স্কুলেই। কিন্তু বেসিলকে ওর বাবা অ্যাঙলিকান স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ওরা চারজনেই খেলতে লাগল স্কুল দলে।

স্কুলের খেলা দুপুর বেলায়। বেশীক্ষণ হয় না। টেনেটুনে ঘণ্টা দুই-আড়াই। তাই ব্যাট করতে নেমে কানহাইরা পিটোতে শুরু করত। জোরে বল কিংবা আস্তে বলের পরোয়া তারা করত না। তাড়াতাড়ি রান করতেই হবে। রান করতে না পারলেই দল থেকে বাদ। তাই সকলেই মেরে খেলতে চাইত। স্কুলের পরেই গলিতে কিংবা পাড়ায় খেলা। কোন রকমে একটা ব্যাট আর একটা বল হয়তো যোগাড় করা সম্ভব হত। প্যাড, গ্লাভ্‌স কিচ্ছু নেই। তাতে কি হয়েছে, গায়ে বল লাগছে—লাগুক ; হাত কেটে যাচ্ছে—কাটুক। ওসব ভয়-টয় করতে হলে আর যাই হোক ক্রিকেট খেলা চলে না। ছোটবেলা থেকেই ওদের মন থেকে ভয়-টয় সব উবে যেত। আর সমস্ত শরীর বিশেষ করে হাত আর পা দুটো সব সময়ই কাটাকুটিতে ভরা থাকত। একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যেত হাত-পায়ের এখানে-ওখানে ফুলে আছে। অবশ্য তাতে কিছু এসে যেত না। খেলা চলত পুরো দমেই। লেগেছে বলে যে খেলবে না, এ কথা ওরা ভাবতেই পারত না।

কানহাইয়ের খেলা দেখে ওর বাবা মোটেই খুশী হতেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল, কানহাই অযথাই সময় নষ্ট করছে। ব্যাট করতে নেমে চটপট চল্লিশ-পঞ্চাশ রান করে ও আউট হয়ে যেত। ওর বাবা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না যে স্কুলের খেলায় তাড়াতাড়ি রান না করলে কিছুতেই চলে না। তবে অন্য সকলেই ওর ওপর খুশী ছিলেন। তাই অল্প বয়সেই কানহাই হয়ে গেল স্কুল দলের অধিনায়ক।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কানহাইয়ের রোখ চেপে গিয়েছিল, তাকে ভাল খেলতেই হবে। দলে চান্স পেতেই হবে। নিজের ব্যাটিংয়ের ওপর খুব একটা আস্থা ছিল না কানহাইয়ের। তাই দলে তার স্থানটি পাকা করার জন্য সে উইকেট-কিপিংও শুরু করল। ফলে স্কুল-দলের সে ছিল উইকেট-রক্ষক ব্যাটসম্যান।

স্কুলের গণ্ডি পেরুতেই ওরা চারজনে পোর্ট মাউরেণ্ট ক্রিকেট ক্লাবে খেলতে শুরু করল। ওরা চারজনে বেশ ভালই খেলত। কানহাই দলের ইনিংসের গোড়াপত্তনের সঙ্গে উইকেট-কিপিংও করত। ভাল খেলে বলে ওদের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। জো সলোমন, বেসিল বুচার আর রোহান কানহাইয়ের নাম তখন সকলেরই জানা।

বড় ক্রিকেটের আসরে আত্মপ্রকাশের সুযোগ কানহাই হঠাৎ পেয়ে গেল। ১৯৫৪ সালের কথা। তখন তার বয়েস সবে আঠারো।

ঠিক হল জর্জটাউনে একটি প্রদর্শনী খেলা হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামকরা প্রায় সব খেলোয়াড়রাই সেই খেলায় খেলবেন। তবে সেই খেলায় একটি দলে আরো তিনজনের দরকার ছিল। পোর্ট মাউরেণ্ট ক্লাবকে বলা হল তাদের তিনজন ভাল খেলোয়াড়কে পাঠাতে। এই তিনজনের মধ্যে ন্যাটা স্পিনার কোবরা রামডাটের মনোনয়নের বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই ছিল না। বাকী দুজনকে বেছে নেওয়া হবে কানহাই, সলোমন ও বুচারের মধ্যে থেকে। ক্লাবের কর্মকর্তারা পড়লেন মহা চিন্তায়। কাকে ছেড়ে কাকে পাঠাবেন। তিনজনেই যে ভাল খেলে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল লটারী করে দুজনকে বেছে নেওয়া হবে। লটারীতে নাম উঠল বুচার আর সলোমনের। কানহাই হেরে

গেল। তার বরাতে জুটল না বড় খেলায় অংশ নেবার সুযোগ। কানহাই সেদিন কেঁদে ফেলেছিল। আঠারো বছরের একটি ছেলের কাছে এ যে কত বড় দুঃখ তা বোধ হয় সকলে ভাবতেও পারবেন না। কানহাইয়ের মনে হল সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আর সে কোনদিনই বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না। সারা রাত ঘুমোতে পারল না। ছটফট করল। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটাই মুছে গেছে।

কিন্তু পরদিন সকালে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। সলোমনের পা মুচকে গেল। ফলে কানহাই পেয়ে গেল তার জীবনের প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে খেলার সুযোগ। ব্যাটে কানহাই মোটেই সুবিধে করতে পারল না। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে পর পর পাঁচজনকে আউট করে দিল ক্যাচ লুফে। আর সে পাঁচটি ক্যাচই তাকে এনে দিল বৃটিশ গিয়ানার পক্ষে নির্বাচনী ম্যাচ খেলার সুযোগ। সেই খেলায় ভালভাবে উইকেট-কিপিং করার সঙ্গে সে ৬২ রান করল। ফলে গায়না দলে তার স্থান মোটামুটি পাকা হয়ে গেল। এবং গায়না দলের সঙ্গে সে বার্বাডোজে খেলতে গেল। সেই দলে ছিলেন বি. পেয়ারাডুঁয়া (অধিনায়ক), ওয়ালকট, গ্লেনডন, গিবস, ল্যান্স গিবস, ম্যাকওয়াট, সনি ইডেন, বেসিল বুচার, রোহান কানহাই প্রভৃতি। বার্বাডোজে গিয়ে কিন্তু সে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না।

ওদিকে অস্ট্রেলিয়া এসে গেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। গিয়ানা দলের হয়ে উনিশ বছরের কানহাই খেলতে নামল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। কানহাই যখন ব্যাট করতে নামল তখন বল করছিলেন কিথ মিলার। মিলারকে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করল না কানহাই। নির্মম-ভাবে পেটাতে শুরু করল। তাঁর আউট সুইঙ্গারগুলো সে বিনা দ্বিধায় স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠাচ্ছিল। কানহাই কোনদিন কেতাবী খেলা শেখেনি। কেউ তাকে বলে দেয়নি যে ঐ ভাবে মারা উচিত নয়। ক্রস ব্যাটে ঐ ভাবে মারতে সে খুব ভালবাসে। অনেক রানও করে। আর সেদিনও সে তাই করতে লাগল।

ওদিকে কানহাইয়ের খেলার ধরন দেখে মিলার থ। তাঁর ধারণাই ছিল না যে ঐ ভাবে কেউ খেলতে পারে। ফলে রেগে-মেগে তিনি আরো জোরে বল করতে লাগলেন। কানহাইও সেগুলো পুল করে বাউণ্ডারীতে পাঠাতে লাগল। মিলার আরো রেগে গেলেন। ওদিকে কিন্তু ওয়ালকট আর কানহাই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কানহাই শেষ পর্যন্ত হাফ-সেঞ্চুরী করার পর আউট হয়ে গেল। খেলার শেষে এক পার্টিতে কানহাইকে দেখেই মিলার এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, "দেখ খোকা, এরপর যদি তুমি এইভাবে মারতে যাও তাহলে বিপদে পড়বে।"

কানহাইয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ খেলছে ছেলেটা। ভাল ব্যাট করে। উইকেট-কিপিংয়েও মন্দ নয়। তবে কোনদিন যে টেস্ট খেলবে এ কথা তখন কানহাই ভাবতেও পারত না। ১৯৫৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ড সফরে যাবে। ইংলণ্ডগামী দলে ঠাঁই পাবার জন্যে সকলেই তখন খুব চেষ্টা করছে। ওদিকে শুরু হয়ে গেছে জর্জটাউনের চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা। জামাইকার বিরুদ্ধে কানহাই ১২৯ রান করল। বার্বাডোজের সঙ্গে কানহাই দারুণ খেলছিল। মার মেরে খেলে তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরী করে ফেলল। লাঞ্চের সময় ওয়ালকট কানহাইকে ডেকে বললেন, "বেশ খেলছ তুমি। ইংলণ্ডগামী দলে আমি তোমাকে দেখতে চাই।" তারপর একটু থেমে বললেন, "একটা ডাবল সেঞ্চুরি করে—তাহলে আমি তোমায় আমার একটা ব্যাট দেব।"

সেই খেলায় কানহাই সত্যিই ভাল খেলল। কিন্তু পাঁচ রানের জন্য পেল না ব্যাটটা। ১৯৫ রান করে আউট হয়ে গেল কানহাই। এরপর টেস্ট দল গড়ার ট্রায়ালে ডাক পড়ল কানহাইয়ের। সেখানেও দারুণ খেলল কানহাই। কানহাইয়ের ব্যাটিং-শক্তির ওপর আর কারো সন্দেহই রইল না। কানহাইয়ের মন জুড়ে তখন মস্ত এক আশা। সে স্বপ্ন টেস্ট খেলার, টেস্ট খেলোয়াড় হওয়ার……।

ইংলণ্ড সফরকামী দলে কানহাই চান্স পেয়ে গেল। অথচ কিছুদিন আগে খেলার সময় এক সংঘর্ষে সে সাংঘাতিক রকম আঘাত পেয়েছিল পায়ে। শুয়ে ছিল অনেকদিন। ইংলণ্ডে যাবার জন্য জাহাজে যখন সে উঠল, তখনও খুঁড়োচ্ছে। পায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অন্য কোন দেশ হলে ঐ রকম আঘাত নিয়ে কোন নবাগত খেলোয়াড়কে বিদেশে পাঠাবার কথা নির্বাচকরা ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সব কিছুই আলাদা। তাই তাঁরা কানহাইয়ের দাবি উপেক্ষা করেননি। জাহাজেই চলতে লাগল কানহাইয়ের চিকিৎসা।

সেবারের ইংলণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুব একটা সুবিধে করতে পারল না। কানহাইয়ের অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রথম দিকে তো খেলতেই পারছিল না। সে হাড়ে হাড়ে টের পেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রোদে ঝলমল মাঠে খেলা এক, আর ইংলণ্ডের বৃষ্টি-ভেজা স্যাঁতসেঁতে উইকেটে খেলা আর এক ব্যাপার। প্রথম পাঁচটি ইনিংসে কানহাই মাত্র ছ' রান করল—০, ০, ০, ৪, ২ রান। অথচ সফরে আসার আগেই পাঁচটা ইনিংসে সে করেছিল ২৯, ৯৫, ৬২, ৯০ ও ১১৭। তবে শেষ পর্যন্ত কানহাই কিছুটা সামলে নিয়েছিল। দেখেছিল রানের মুখ। প্রথম টেস্টে ৪২, তৃতীয় টেস্টে ৪৭ রান। উল্লেখ করার মত এই-ই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেবার গো-হারা হেরে দেশে ফিরে গেল। জীবনের প্রথম সফরে এমন বিশ্রীভাবে হেরে যাবার কথা কানহাই সহজে ভুলতে পারেনি।

১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারত সফরে এল। তার আগে পাকিস্তান গিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। আলেকজাণ্ডারের ওপর পড়ল নেতৃত্বের ভার। আলেকজাণ্ডার উইকেট-রক্ষক। তাই কানহাইকে জলাঞ্জলি দিতে হল উইকেট-রক্ষক হিসেবে দলে ঠাঁই পাবার আশা। ব্যাটিংয়ের ওপরই জোর দিল সে। এবং দলের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল।

সেবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্যারী সোবার্স ৩৬৫ রান করে

ভেঙে দিয়েছিল স্যার লেন হাটনের সব থেকে বেশী রান করার রেকর্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুব সহজেই রাবার পেয়ে গেল। কানহাইও মোটামুটি ভালই খেলেছিলেন।

ভারত সফরে এসে ভারতীয়দের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন গিলক্রিস্ট আর হল। বিশেষ কোন ব্যাটসম্যান বিক্ষিপ্ত লগ্নে ছাড়া কোন সময়ই ওঁদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। দল গড়া নিয়েও সেবার সমস্যার অন্ত ছিল না। পাঁচটি টেস্টে চারজনের ওপর পড়েছিল দল পরিচালনার ভার। এই চারজন হলেন—উমরিগড়, গোলাম আমেদ, ভিনু মানকাদ ও হেমু অধিকারী।

কানহাই সেবার সুভাষ গুপ্তের বিরুদ্ধে মোটে খেলতেই পারছিল না। বারবার আউট হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রান করার পর সে গুপ্তের বলে ধরা পড়ল পঙ্কজ রায়ের হাতে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টেও কোন রান করার আগে সে আউট হল গুপ্তের বলে। বারবার গুপ্তের বলে আউট হয়ে যাওয়ায় গুপ্তে কানহাইকে খরগোশের মত ভীরু বলে ধরে নিয়েছিলেন। কানপুর টেস্টে যেদিন কানহাইকে গুপ্তে আবার হার মানালেন, সেই দিনই চা-পানের সময় ঘটল একটা ঘটনা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ভারতের খেলোয়াড়রা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। গল্প-টল্পও চলছিল তখন। গুপ্তে সেখানে ছিলেন না। হঠাৎ এসে ঢুকলেন। তারপর কানহাইয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন "এই যে খরগোশ মশাই!" গুপ্তের বলার ধরনে সকলে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। আর রাগে-দুঃখে-লজ্জায় জ্বলে উঠল কানহাই। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, "আচ্ছা, এবার তোমায় দেখে নেব।"

কানহাই তার কথা রেখেছিল। কলকাতার তৃতীয় টেস্টে তার খেলার কথা এখনও তাই সকলের মুখে মুখে ঘোরে। সুভাষ গুপ্তেকে সে মোটে পরোয়াই করেনি। মেরে ছাতু করে দিয়েছিল। তার মারের দাপটে সেদিন থরথর করে কেঁপেছিল ইডেনের সবুজ চত্বর।

আর সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলির সাক্ষী ছিলেন ইডেনের ষাট-সত্তর হাজার দর্শক। খরগোশ বলার প্রতিশোধ কানহাই সেদিন ভালভাবেই নিল। গ্যারী সোবার্সের পেটের অসুখ হওয়ায় কানহাই ব্যাট করতে নামল তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। আর দিনের শেষে সে ২০৩ রান করে অপরাজিত রয়ে গেল। পাঁচ ঘণ্টা উইকেটে থেকে সে হাঁকিয়েছিল চৌত্রিশটি বাউণ্ডারী। সেঞ্চুরী করতে কানহাই সেদিন সময় নিয়েছিল মাত্র ১৩২ মিনিট। আর অপরাজিত চতুর্থ উইকেট জুটিতে বুচার ও কানহাই ১৪৪ মিনিটে যোগ করল ১৭৯ রান। পরের দিন ২৫৬ রান করে তবেই কানহাই হার স্বীকার করেছিল। ভারত সফরে এসেই বেসিল বুচার ও জো সলোমন প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিল।

মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খাঁ মারা গেলেন। নবাব বোধহয় জানতেন, তিনি বেশীদিন বাঁচবেন না। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সব ব্যবস্থা তিনি আগে থাকতেই করে রেখেছিলেন। মনসুর চলে গেল ইংলণ্ডে আর তার বোনেরা সুইজারল্যাণ্ডে।

সাসেক্সে ম্যাকডোনাল্ডরা ছোটদের একটি স্কুল চালাতেন। মনসুর উঠল ম্যাকডোনাল্ডদের বাড়িতেই। ভীষণ মন কেমন করত। মা কতদূরে—সেই ভূপালে কিংবা পাতৌদিতে। বোনেরাও কাছে নেই। আর বাবা···। কান্না পেত তার। এগারো বছরের মনসুর একা বসে বসে কাঁদত। যখন আর থাকতে পারত না, তখন ব্যাট-বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। খেলার মধ্যে ডুবে গেলে কিচ্ছু মনে থাকত না তার।

মনসুর খেলা শিখতে শুরু করল নামকরা খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক উলির কাছে। বিশ্ববিখ্যাত ন্যাটা ব্যাটসম্যান উলিই মনসুরের বাবার আদর্শ খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর কাছে খেলা শেখা আর লেখাপড়া করা এক সঙ্গে চলতে লাগল। বছরে একবার বাড়ি আসতে পারত সে। মনসুর শীতকালটাকেই বেছে নিল। কারণ শুধু শীতকালেই ভারতে পুরোদমে ক্রিকেট খেলা চলে। ঐ সময় দেশে ফিরে সেও মেতে উঠত ক্রিকেট খেলা নিয়ে। কখনো পাতৌদি, কখনো মামার বাড়ি ভূপাল আবার কখনো দিল্লিতে—ছুটির দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরই পেত না সে। তারপর একদিন আবার ফিরে যেতে হতো ইংলণ্ডে।

ম্যাকডোনাল্ডদের ছোটদের স্কুল ছেড়ে মনসুর ভর্তি হল উইনচেস্টারে। ওয়েলিংটনের ক্রিকেট প্রশিক্ষক ছিলেন সাসেক্সের অল-রাউণ্ডার জর্জ কক্স। তাঁর কাছে মনসুর তখন খেলা শিখতে লাগল। তবে ততোদিনে সে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে। উইনচেস্টারে চার

বছরে সে করল ২,০৩৬ রান। এর মধ্যে আবার শেষ আঠারোটি ইনিংসে সে তুলল ১,০৬৮ রান। সেই সঙ্গে সে ভেঙে দিল স্কুল ক্রিকেটে ডি. আর. জার্ডিনের রেকর্ড। জার্ডিন ছিলেন ইংলণ্ডের দারুণ নামকরা খেলোয়াড়। অনেক বছর তাঁর ওপরই ইংলণ্ড দল পরিচালনার ভার ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে যে ইংলণ্ড দলটি অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল সেই দলেই ছিলেন মনসুরের বাবা পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খাঁ। জার্ডিনের ছেলেও মনসুরদের সঙ্গে পড়ত। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় তার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না।

১৯৫৬ সালে স্কুলের ব্যাটিং গড়ে পাতৌদি তৃতীয় হল ৩৫৪ রান করে। সেবার তার সর্বোচ্চ রান ছিল অপরাজিত ৬৬। পরের বছর সে আরো ভালো খেলল। গড়ে ইনিংস প্রতি ৬৫·৪৬ রানের হিসেবে করল ৮৫১। সর্বোচ্চ ১২৭ অপরাজিত।

১৯৫৭ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মনসুর প্রথম কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে শুরু করে। সাসেক্সের হয়ে সে ছ'টি ম্যাচের ন'টি ইনিংস খেলে ১৪৫ রান করেছিল। হোভে মিডলসেকসের বিরুদ্ধে ৪৬ রানই ছিল সেই মরশুমে কাউন্টি ক্রিকেটে তার সর্বোচ্চ।

ব্যাটসম্যান হিসেবে পাতৌদি তখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নাম ছড়িয়ে পড়ছে তার। সকলেই তার বাবার সঙ্গে তরুণ পাতৌদির তুলনা করছে। 'উইসডেন'ও সে কথা লিখেছে। ইতিমধ্যেই সে খেলেছে লর্ডসে পাবলিক স্কুলের পক্ষে, আর উইনচেস্টারের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছে।

কিন্তু সেইবারেই উইনচেস্টার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথম হারল। তবে হ্যারোর সঙ্গে সেই খেলাটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। সেই খেলায় মনসুর ৯৫ রান করার পর হঠাৎ কভারে ক্যাচ তুলে আউট হয়ে যায়। তারপর উইনচেস্টার পর পর ক'টি উইকেট হারাল। তাদের শেষ ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করতে নামল তখন জয়ের জন্যে মাত্র দুটি রান দরকার। পাতৌদি তাকে বলে দিল 'পেটাও'। কিন্তু

বলটা ছিল একদম সোজা। 'ক্রস ব্যাটে' হাঁকাতে যেতেই বলটা তার ব্যাট গলে উইকেট ভেঙে দিল। মাত্র এক রানে হেরে গেল পাতৌদির দল।

সেই বছর মনসুর ভেঙে দিল ইংলণ্ডের অধিনায়ক জার্ডিনের রেকর্ড। ১৯১৯ সালে জার্ডিন স্কুল ক্রিকেটে ৯৯৭ রান করে যে নজির গড়েছিলেন এতদিন তাকে কেউ ভাঙতে পারেনি। কিন্তু তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে মনসুর করল ১,০৬৮ রান। শুধু তাই নয়, কাউন্টি ক্রিকেটেও সে বছর পাতৌদি দারুণ খেলল। ট্রুম্যান তখন ইয়র্কশায়ারে খেলেন। দারুণ জোরে বল করেন। ঐ সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বোলার। হোভে সাসেক্সের পক্ষে খেলতে নেমে পাতৌদি করল ৫২ রান। আর তারই স্বীকৃতি হিসেবে ইংলণ্ডের 'ক্রিকেট সোসাইটি' সেবার মনসুরকে সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

১৯৬০ সালে স্কুলের পাঠ শেষ করে মনসুর অক্সফোর্ডের বেলিওল কলেজে ভর্তি হল। এই কলেজেই মনসুরের বাবা ইফতিকার আলি খাঁ ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পড়েছিলেন। এবং ব্লু পেয়েছিলেন।

লর্ডস মাঠে কেমব্রিজের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেন তরুণ পাতৌদি। কেমব্রিজ দলে তখন টনি লুইস, রজার প্রিডুরা খেলত। তবু তারা ১৫৩ রানের বেশী করতে পারলো না। কিন্তু অক্সফোর্ড ব্যাট করতে নামলেই তারা পালটা আঘাত হানল। অ্যালান স্মিথ্, ডেভিড গ্রীন ও আব্বাস আলি বেগকে তারা চটপট আউট করে দিল। জাভেদ বার্কি (পরে পাকিস্তানের অধিনায়ক হয়েছিলেন) তখন উইকেটে। মনসুর আর বার্কি মিনিটে এক রান হিসেবে ১৯০ তুলে ফেলল চটপট। মনসুর শেষ পর্যন্ত ১৩১ রান করে আউট হল। এর মধ্যে সে ১৮টি চার ও একটি ছক্কা হাঁকিয়েছিল। বাবার মতো তরুণ পাতৌদিও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শতরান করার গৌরব অর্জন করল।

১৯৬১ সালে ই. ডবল্যু. সোয়ানটন টেস্ট আর কাউন্টি খেলোয়াড়দের দিয়ে একটা দল গড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গেলেন। সেই দলে স্থান পেল মনসুর আলি খাঁ। উইকস, রে লিণ্ডওয়াল প্রভৃতি নামকরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেল সে।

এক মাসের সেই সফর শেষ করে ইংলণ্ডে ফিরতেই তাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হল। আর সেইবারই সে খেলল সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে। রিচি বেনো সেবারের অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন।

কলেজ ও কাউন্টি ক্রিকেটে মমসুর তখনই দারুণ নামকরা খেলোয়াড়। বাবার মতো সেও তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে টেস্টে খেলার জন্যে। নামকরা ব্যাটসম্যান হতে চায় সে। এমন একজন মারকুটে ব্যাটসম্যান যাকে ভয় করবে সব বোলাররা। সে হাঁকাবে সেঞ্চুরী। তারপর একদিন....

হ্যাঁ, তারপর একদিন সেও বাবার মতো ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবে। দেশ-বিদেশে তার নেতৃত্বে ভারত খেলবে। জিতবে ভারত। আরো কত স্বপ্নই না দেখত মনসুর।

সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে সে। সামনে উজ্জ্বল ভাবিষ্যৎ তার। সেই স্বপ্নই সে দেখত।

কিন্তু অলক্ষ্যে বসে আছেন আর একজন, তিনি তখন হাসছেন। তরুণ মনসুর ভাবতেও পারত না কি সাংঘাতিক বিপদই না পা টিপে-টিপে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তার সব স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের মতো নষ্ট করে দেবার জন্যে। অত বড় বিপদের আঁচ কেউ কোনদিন করতে পারেনি।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসেই অভিশপ্ত দিনটি তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দুর্ঘটনার সেই দিনটি। ভবিষ্যতে যা মনসুরের সমস্ত জীবন ওলট-পালট করে দিতে বসেছিল।

আচমকা ঘটে গেল সেই মোটর দুর্ঘটনা।

সেদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাসেক্সের খেলা। বিশ্ববিদ্যালয় দলের ফিল্ডিং। সারাটা দিন পাতৌদিদের মাঠে মাঠে কেটেছে। দারুণ খাটুনি গেছে। ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে শরীর। প্যাভেলিয়নে পাতৌদি টান-টান হয়ে শুয়েছিলেন।

কে একজন বলে উঠলেন, 'চল, চাইনিজ খেয়ে আসি।'

লাফিয়ে উঠলেন পাতৌদি। চীনে খাবার খেতে মনসুর দারুণ ভালোবাসেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন পাঁচ বন্ধু। সুপ থেকে আরম্ভ করে পাঁচ-ছ' পদের পেটভরা খাওয়া খেয়ে ওঁরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরুলেন, তখন আর কেউই ক্লান্ত নন।

সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে। সেদিনের সেই সন্ধ্যেটা সকলের ভালো লাগার মতো। হোটেলও খুব কাছে। টেনে-টুনে শ' তিনেক গজ দূরে হবে। মনসুরের তিন বন্ধু ঠিক করে ফেললেন যে সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে তবেই তাঁরা ঘরে ফিরবেন।

'আমাদের সঙ্গে এসো প্যাট।'

একজন ডাকলেন।

রবিন ওয়াটারসের সঙ্গে তার মরিস গাড়িটা ছিল। ঐ গাড়িতে করেই মনসুর আর তার বন্ধুরা চাইনিজ খেতে এসেছিলেন। পাতৌদির ইচ্ছে করছিল না তখন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়তে চাইছে ক্লান্ত শরীর।

পাতৌদি বললেন, 'আমি রবিনের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমরা ঘুরে এস।'

ওঁরা চলে গেলেন। পাতৌদি গিয়ে সামনের সিটে রবিনের পাশে বসলেন। সবে গাড়িটা চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ একটা বড় গাড়ি রাস্তার মধ্যিখানে এসে পাতৌদিদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। রবিন কিছু করার আগেই তাঁর মরিস গাড়িটা গিয়ে বড় গাড়িটার সামনে সজোরে ধাক্কা মারল।

ধাক্কা সামলাতে পাতৌদি ডান দিকে সামান্য ঘুরে গেলেন।

তাঁর ডান কাঁধটা প্রচণ্ড জোরে উইণ্ডস্ক্রীনের গায় লাগল। প্রচণ্ড আঘাত। কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মারাত্মক দুর্ঘটনা নয়। রবিনের কপাল কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। আর বিশেষ কোথাও লাগেনি। রবিনকে উঠতে দেখে পাতৌদি বললেন, 'আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। আমি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাটায় আর খেলতে পারব না।'

পাতৌদি তখনো জানেনই না যে, তাঁর চোখে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কারণ, তাঁর চোখে কোন রকম ব্যথা বা যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে ছিল না।

কিন্তু পরদিন সকালে ব্রাইটন হাসপাতালে পাতৌদি আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁকে বলা হল যে, তাঁর ডান চোখে তখনই অপারেশন করতে হবে।

উইণ্ডস্ক্রীনের ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো তাঁর চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে। সেটাকে এখনি বের করতে হবে।

খবরটা শুনে মনসুর যেন পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর ডান চোখে কাঁচের টুকরো! অস্ত্রোপচার করতে হবে! আর দেখতে পাবেন তো ঐ চোখে! দেখতে না পেলে খেলবেন কি করে? ভীষণ কান্না পেল পাতৌদির। তিনি যে এখনো খেলা শুরুই করতে পারেননি। কত আশা তাঁর। টেস্ট ম্যাচ খেলবেন। বাবার মতো ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবেন—সবই শেষ হয়ে যাবে এখনই। ডান চোখে যদি তিনি দেখতে না পান, তাহলে তো তাঁর খেলাও শেষ। এক চোখে কি আর ক্রিকেট খেলা যায়?

হতাশায় ভেঙে পড়লেন কুড়ি বছরের তরুণ পাতৌদি।

খালি মনে হতে লাগল, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, যা হোক একটা ব্যবস্থা তিনি করতেনই। আজ তাঁর কি হবে?

বাবা নেই। মা সেই কত দূরে—ভারতে। বোনেরাও কাছে নেই। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। একা-একা এই হাসপাতালে পাতৌদির নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। চোখই যদি গেল, তাহলে

তাঁর আর কি রইল। অজান্তেই মনস্থুরের চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসে জল।

স্যার বেঞ্জামিন রাইক্রফ্ট দেখা করতে এলেন পাতৌদির সঙ্গে। চক্ষু-বিশেষজ্ঞ হিসেবে রাইক্রফ্টের দারুণ নাম। তিনি এসে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে এখন থেকে এক চোখেই খেলতে হবে। ডান চোখে 'কণ্ট্যাক্ট লেন্স' লাগালে অবশ্য তুমি নব্বুইভাগ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কিন্তু খেলার মতো সড়গড় হতে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে। কারণ, তুমি ঐ চোখে সবকিছুই ছুটো করে দেখবে।'

দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল পাতৌদির। এতক্ষণে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তাঁর একটা চোখ প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। কিন্তু আর কখনো ক্রিকেট খেলতে পারবেন না—এ কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। ক্রিকেট ছাড়া তিনি বাঁচবেন কি নিয়ে? ক্রিকেট ছাড়া যে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই। ক্রিকেটকে বাদ দিলে তাঁর জীবনে আর কিছুই যে অবশিষ্ট থাকে না।

পাতৌদি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, তিনি আর কোনদিন খেলবেন না। প্রথমটায় ভেবেছিলেন, সাসেক্সের সঙ্গে খেলাটায় তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন না। তারপর ভেবেছিলেন, অক্সফোর্ডের বাকি তিনটি ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, তিনি হয়তো আর কোনদিনই খেলতে পারবেন না।

ডাঃ ডেভিড রবার্টস পাতৌদির চোখ অপারেশন করলেন। চোখের মধ্যে থেকে কাঁচের টুকরো বের করে আনার সময় মণিটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। পাতৌদির ডান চোখে তখন কোন দৃষ্টিই ছিল না।

কিন্তু পাতৌদি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তিনি আর খেলতে পারবেন না। ওদিকে পাতৌদির জায়গায় কলিন ড্রাইবার্গ অক্সফোর্ডের অধিনায়ক মনোনীত হলেন। ছুর্ঘটনার পর রবিন ওয়াটার্সও আর আগের মতো খেলতে পারছিলেন না। তাঁর জায়গায় উইকেটরক্ষকতার দায়িত্ব নিলেন সি. বি. ফ্রাইয়ের নাতি সি. এ. ফ্রাই।

অপারেশনের পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পাতৌদির তিন-চার সপ্তাহ লেগে গেল। সবদিক থেকে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। যা করতে যান তাতেই ভুল। সিগারেট ধরাবার জন্যে লাইটার জ্বাললে সেটা রয়ে যায় ইঞ্চিখানেক দূরে। চলতে ফিরতেও বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। গ্লাসে জল ঢালতে গেলে জল পড়ে যায় মাটিতে। এক চোখে দারুণ মুশকিল হচ্ছে সব কিছুতেই।

কিন্তু হার মানার ছেলে পাতৌদি নন। আস্তে আস্তে নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে রপ্ত করতে লাগলেন। দিনের পর দিন চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে। না, এখন তো আর জল ঢালতে গেলে মাটিতে পড়ে না। দিব্যি গ্লাস ভরে ওঠে। সিগারেট জ্বালাতে আর অসুবিধে হয় না। খাওয়ার সময় কাঁটা-চামচ ঠিক মুখেই যায়।

খুশী হয়ে উঠলেন পাতৌদি। হ্যাঁ, পরিস্থিতির সঙ্গে এবার তিনি নিজেকে মানাতে পারছেন। ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে সব অসুবিধে। এইবার আসল কাজ। ব্যাট-বল নিয়ে মাঠে নামতে হবে। নেটে গিয়ে দেখতে হবে ঠিকমত খেলতে পারেন কিনা।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে 'কণ্ট্যাক্ট লেন্স' লাগালেই সব কিছুই দুটো করে দেখতে শুরু করেন পাতৌদি। ঐ অসুবিধে দূর করতেই হবে। তা সে যেভাবেই হোক না কেন।

নেট প্র্যাকটিস করতে এলেন পাতৌদি। সঙ্গে তাঁর সাসেক্সের প্রশিক্ষক জর্জ কক্স। তিনি বল করতে লাগলেন। প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারছিলেন না পাতৌদি। বলের লেংথ ডিরেকশান কিচ্ছু না। ব্যাট চালাতে গেলে বল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাঁর ব্যাট এক জায়গায়, বল আর এক জায়গায়।

ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি বদলে ফেললেন পাতৌদি। এতদিন যেভাবে দাঁড়াতেন, তার চেয়ে একটু ঘুরে দাঁড়ালেন। যদি তাতে কিছু সুবিধে হয়। কিন্তু কই, তাতেও তো বিশেষ কোন লাভ হচ্ছে না। বার বার ফসকাচ্ছেন। কিছুতেই আগের মতো সেই স্বচ্ছন্দ বোধ, সেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন না।

তাহলে⋯?

হতাশায় ভেঙে পড়তে চাইছিল পাতৌদির মন। তবে কি সত্যিই তাঁকে খেলা ছেড়ে দিতে হবে? চিরদিনের মতো তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে মাঠ! তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, তাঁর সব আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে যাবে। আর তিনি কোনদিন ক্রিকেট খেলতে পারবেন না! বাবার মতো টেস্ট খেলতে পারবেন না, হতে পারবেন না ভারতের অধিনায়ক? মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁকে ফুরিয়ে যেতে হবে? চুপি চুপি সরে যেতে হবে ক্রিকেট মাঠ থেকে?

না, না, না, তা হতে পারে না। তা কিছুতেই হতে দেবেন না পাতৌদি। তাঁর মন প্রাণ বিদ্রোহ করে ওঠে। তাঁকে খেলতেই হবে। তা সে যে ভাবেই হোক।

কিন্তু তা কি করে হবে? সব কিছুই যে তুটো করে দেখছেন। বোলার বল করলে তিনি দেখেন তুটো বল তাঁর দিকে ছুটে আসছে। কি করবেন তাহলে পাতৌদি? হার মেনে নেবেন? কিন্তু হার মানা তো তাঁর স্বভাব নয়। শেষ চেষ্টা যে তাঁকে করতেই হবে।

আবার ব্যাট হাতে নিয়ে নেটে ফিরে এলেন পাতৌদি⋯।

লেখাপড়া বন্ধ। অন্তত বছরখানেক তো বটেই। ডাক্তার-বাবুদের কড়া নির্দেশ। তবে খেলতে পারেন। ক্রিকেট মাঠে যতক্ষণ খুশি সময় কাটাতে পারেন। সে কথা শুনে খুশী হয়েছেন পাতৌদি। খেলাও যদি বন্ধ হত তাহলে আর দেখতে হত না।

লেখাপড়া যখন বন্ধ তখন আর ওদেশে থেকে কি হবে? অক্সফোর্ড থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন পাতৌদি। তারপর তাঁর সারাটা দিন কাটতে লাগলো খেলার মাঠে। ব্যাট হাতে নিয়ে নিজেকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি।

পাতৌদির আগে এই রকম তুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিলেন কয়েকজন খেলোয়াড়। কিন্তু তাঁরা কেউই আর খেলতে পারেননি। পাতৌদির তুর্ঘটনার ক'বছর পরে ইংলণ্ডের নামকরা একজন টেস্ট

খেলোয়াড় কলিন মিলবার্নের চোখ এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাজার চেষ্টা করেও তিনি আর ফিরে পাননি নিজের স্বাভাবিক খেলা। সকলের অলক্ষ্যে চুপি চুপি তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল খেলার মাঠ থেকে।

কিন্তু ঐরকমভাবে হার পাতৌদি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আবার তিনি খেলার মাঠে ফিরে আসতে পারবেন। আবার তিনি খেলবেন। মস্তবড় খেলোয়াড় হবেন। তাই সারাদিন ধরে চলতে লাগল তাঁর সাধনা। রোজ রোজ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। একটি দিন বিরাম নেই। এতটুকু অবসর নেই।

ডান চোখে তিনি অল্প অল্প দেখতে পান। কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তি ক্রিকেট খেলার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। দুটি সম্পূর্ণ সুস্থ চোখ নিয়েও সকলে ফাস্ট বোলারদের মোকাবিলা করতে পারেন না। ভালো করে দেখতেই পান না বল। কিন্তু সে চিন্তা পাতৌদির নেই। তিনি খেলবেনই। তাঁকে ভালো খেলতেই হবে।

পাতৌদির চোখের আঘাত কতটা এবং তার গুরুত্বই বা কতটা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সকলের ছিল না। দুর্ঘটনার আর চোখে অস্ত্রোপচারের খবরে সকলে ধরে নিয়েছিলেন যে মনসুর আর হয়তো খেলতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর অনুশীলনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকলে ভাবলেন যে ঐ দুর্ঘটনা বোধহয় তেমন কিছু মারাত্মক ছিল না। নেহাতই মামুলী দুর্ঘটনা। অবশ্য একদিক দিয়ে তা ভালোই হয়েছিল। অহেতুক সমবেদনা জানানো আর সন্দেহের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন পাতৌদি।

সে বছর টেড ডেক্সটারের নেতৃত্বে এম. সি. সি. দল ভারত সফরে এল। হায়দরাবাদে এম. সি. সি.র সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি একাদশের খেলা। পাতৌদিকে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি সভাপতি একাদশের নেতৃত্ব করতে পারবেন কি না। লাফিয়ে উঠলেন পাতৌদি। এ যে একেবারে অযাচিত সুযোগ। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মস্ত এক সম্ভাবনা। দিনের পর দিন

তিনি যে সাধনা করেছেন তা সফল হয়েছে কি না তার পরীক্ষাই এবার হবে। এই পরীক্ষায় পাস-ফেলের ওপর নির্ভর করছে পাতৌদির ভবিষ্যৎ খেলোয়াড় জীবন।

টস করে প্যাভেলিয়নে ফিরছিলেন ডেক্সটার আর পাতোদি। ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলেন, 'টাইগার, তুমি কি করবে?'

পাতৌদি বললেন, 'টেড, তুমি কি করতে চাও?'

'আরে তুমিই তো টসে জিতেছ। কি করবে তুমিই বল টাইগার।'

'আমরা তাহলে ব্যাটই করব।' ডেকস্টারের দিকে তাকিয়ে পাতৌদি হাসলেন।

খেলা শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু বোর্ড সভাপতি দলের কয়েকটা উইকেট চটপট পড়ে গেল। পাতৌদিকে ব্যাট করতে নামতে হল। আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, কনট্যাক্ট লেন্সটা পরে ব্যাট করবেন। চোখে লেন্সটা লাগিয়ে নিয়ে ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন পাতৌদি।

আশা-নিরাশার দোলায় তাঁর মন তখন দুলছে। খেলতে পারবেন তো ঠিকভাবে! এই তাঁর পরীক্ষা। মনে পড়ল তাঁর ইংলণ্ডের সেই ডাক্তারবাবুর কথা। তিনি বলেছিলেন, কনট্যাক্ট লেন্স লাগালে তুমি নব্বুই শতাংশ দৃষ্টি ফিরে পাবে।

কিন্তু মহামুশকিল। কনট্যাক্ট লেন্স লাগানোর পর পাতৌদি সব জিনিস দুটো করে দেখতে লাগলেন। দুটো করে বল ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলারদের বল যেমন জোরালো তেমনি বাঁক খাওয়া।

পাতৌদি দেখছেন, বোলারদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর তাঁর দিকে ছুটে আসছে দুটো বল। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা খেলবেন। দুটো বলের মধ্যে ছ-সাত ইঞ্চি ফাঁক। বাইরের বলটা ছেড়ে পাতৌদি মধ্যের বলটা খেলতে লাগলেন। ধরে ধরে দেখে দেখে

খেলতে হচ্ছে। কি অপরিসীম ধৈর্য আর মনোবল থাকলে তবেই ঐভাবে খেলা সম্ভব।

ঐভাবে চা পানের সময় পর্যন্ত খেলে গেলেন পাতৌদি। প্রতিটি ওভারের প্রত্যেকটি বল তাঁর সামনে ছুটো করে আসছে। বাইরেরটা ছেড়ে দিয়ে তিনি খেলছেন মধ্যেরটা। ঐভাবে খেলে ৩৫ রান করলেন তিনি।

প্যাভেলিয়নে ফিরে ডান চোখ থেকে কনট্যাক্ট লেন্সটা খুলে ফেললেন পাতৌদি। ঐভাবে খেলতে যতটা না পরিশ্রম হয় তার চেয়ে কষ্ট হয় অনেক বেশী। তা হোক। ঐ ৩৫ রান যে তাঁর কাছে শত রানের চেয়েও বেশী মূল্যবান। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন তিনি। হ্যাঁ, তিনি আবার খেলতে পারবেন। নামকরা খেলোয়াড় হতে পারবেন। টেস্ট খেলতে পারবেন। বাবার মতো তিনিও হবেন ভারতের অধিনায়ক। স্বপ্নগুলো আবার পাতৌদির মনে দানা বেঁধে উঠল।

কিন্তু তার জন্য তাঁকে যে আরো ভালো খেলতে হবে। তা তিনি খেলবেনই। কনট্যাক্ট লেন্স পরে চা-পানের সময় পর্যন্ত খেলে তিনি ৩৫ রান করেছেন। এবার তিনি কনট্যাক্ট লেন্স ছাড়াই খেলবেন। তার মানে তাঁকে ডান চোখ বন্ধ করে খেলতে হবে। খেলতে হবে একমাত্র বাঁ চোখের ওপর নির্ভর করেই।

বিরতির পর মাঠে নামলেন পাতৌদি। এবার আর তাঁর চোখে কনট্যাক্ট লেন্স নেই। আর তিনি ছুটো করে বল দেখবেন না। কিন্তু তার বদলে তাঁকে খেলতে হবে এক চোখে। তা বোধ হয় আরো মুশকিল ব্যাপার, বোধহয় আরো কষ্টসাধ্য।

ডান চোখটা বন্ধ করে খেলতে লাগলেন পাতৌদি। দিব্যি খেলছেন। খেলা দেখে তাঁর অসুবিধের কথা, কষ্টের কথা কেউই বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারছেন না। রান করছেন একটির পর একটি। বাউণ্ডারির পর বাউণ্ডারি হাঁকাচ্ছেন। দেখতে দেখতে আরও পঁয়ত্রিশ রান করে ফেললেন পাতৌদি। কিন্তু ৭০ রানের মাথায় তিনি টনি

ব্রাউনের বলে ধরা পড়ে গেলেন কেন ব্যারিংটনের হাতে। পাতৌদির ঐ ৭০ রানই বোর্ড সভাপতি একাদশের সর্বোচ্চ রান ছিল।

দুর্ঘটনার পর প্রথম বড় খেলা পাতৌদি ভালোই খেললেন। এবং তাঁর ঐ ৭০ রান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে তাঁর জায়গা করে দিল। কিন্তু নির্বাচকরা যদি কোনভাবে জানতে পারতেন, পাতৌদির চোখে কতটা ক্ষতি হয়েছে এবং প্রতিটি রানের জন্যে তাঁকে কি দারুণ পরিশ্রম ও কষ্ট করতে হয়—তাহলে তাঁরা হয়তো তাকে টেস্ট দলে নিতেন না।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য পাতৌদির যে তিনি কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারলেন না। ফুটবল খেলতে গিয়ে তাঁর পায়ের গোড়ালিতে চোট লাগল। তাই জীবনের প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন পাতৌদি।

তবে তার জন্য তাঁকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। দিল্লীর তৃতীয় টেস্টে তাঁকে দলে নেওয়া হল। টেস্ট খেলার আনন্দে আত্মহারা পাতৌদির মনে তখন গভীর সন্দেহ। তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মতো সুস্থ হয়ে উঠেছেন? তিনি পারবেন তো ভালো খেলতে?

১৯৬১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর দিল্লীর ফিরোজ-শা কোটলায় ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ শুরু হল। পাতৌদি চার নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যাট করতে নামলেন। তবে তার আগেই জয়সীমা ও মঞ্জেরেকার শতরান করে ভারতকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাতৌদি সুবিধে করতে পারলেন না। ১৩ রান করার পর ডেভিড অ্যালেনের বল মারতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন রিচার্ডসনের হাতে। দ্বিতীয়বার আর ব্যাট করার সুযোগ পেলেন না পাতৌদি। খেলার শেষ দিন বৃষ্টিতে ভেসে গেল এবং আগের দুটির মতো দিল্লীর তৃতীয় টেস্ট ম্যাচও শেষ হল অমীমাংসিতভাবে।

কলকাতার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচেও খেলার জন্য মনোনীত হলেন

পাতৌদি। নরী কণ্ট্রাক্টরের নেতৃত্বে কলকাতার এই টেস্টে ভারত ইংলণ্ডকে ১৮৭ রানে হারিয়ে দিল। কণ্ট্রাক্টরের অনুপস্থিতে শেষ দিনের খেলায় পলি উমরিগড় ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাতৌদি ৬৪ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৩২।

মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট দলে স্থান পেতে তাই পাতৌদির বিশেষ অসুবিধে হল না। ঐ টেস্টটি দু'দলের কাছেই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করবে জিতে রাবার নিজেদের হাতে রাখতে। আর ভারতের লক্ষ্য হবে জিততে না পারলেও ড্র করে দেশের মাটিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম রাবার জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করতে।

মাদ্রাজেও টসে জিতলেন নরী কণ্ট্রাক্টর। মাদ্রাজ নিয়ে পর পর চারটি টেস্টে কণ্ট্রাক্টর টসে জিতেছেন। খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু শুরুটা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

ইংলণ্ডের স্পিন বোলার টনি লক, ডেভিড অ্যালেন আর বব বারবার তখনই অনেকটা করে বল ঘুরোতে পারছিলেন। দলের ৭৪ রানের সময় পাতৌদি ব্যাট করতে নামলেন। অন্যদিকে তখন নরী কণ্ট্রাক্টর।

দুজনে মিলে রান করে চললেন। ফিল্ডারদের মাথার উপর দিয়ে বল তুলে দিয়ে রান নিচ্ছেন পাতৌদি। ভারতে ঐভাবে বিশেষ কেউ রান করেন না। মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রথম ঘণ্টায় ওঁরা ৮২ রান যোগ করলেন। কিন্তু ৮৬ রান করে কণ্ট্রাক্টর বারবারের বলে সরাসরি বোল্ড আউট হয়ে গেলেন।

পাতৌদি খেলতে লাগলেন। তাঁর লক্ষ্য শতরান করা। জীবনের তৃতীয় টেস্ট খেলছেন পাতৌদি। অত বড় দুর্ঘটনার পর ধরতে গেলে এক চোখে খেলছেন পাতৌদি। কিন্তু কি দারুণ তাঁর খেলা! চোখ-ধাঁধানো ব্যাটিং। বাউণ্ডারি, ওভার বাউণ্ডারি হাঁকাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে এক সময় তাঁর শতরান পূর্ণ হল। টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করলেন পাতৌদি। কিন্তু তারপরই তাঁর মনোযোগ ছিন্ন হয়ে

গেল। ১০৩ রানের মাথায় ব্যারি নাইটের বলে লকের হাতে ধরা পড়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন পাতৌদি। ঐ রান করতে তিনি হাঁকিয়েছিলেন দুটি ছক্কা ও ষোলটি বাউণ্ডারী।

পরে অষ্টম উইকেটে রেকর্ড সংখ্যক ১০১ রান যোগ করলেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ও বাপু নাদকার্ণী। তারপর ভারত ২৮১ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস মুড়িয়ে দিল। প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই ইংলণ্ড ১৪৭ রানে পিছিয়ে পড়ল। এবং শেষ পর্যন্ত খেলার শেষ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের একটু পরেই ভারত ১২৮ রানে হারিয়ে দিল ইংলণ্ডকে।

দেশের মাটিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সেই প্রথম রাবার জয়।

—